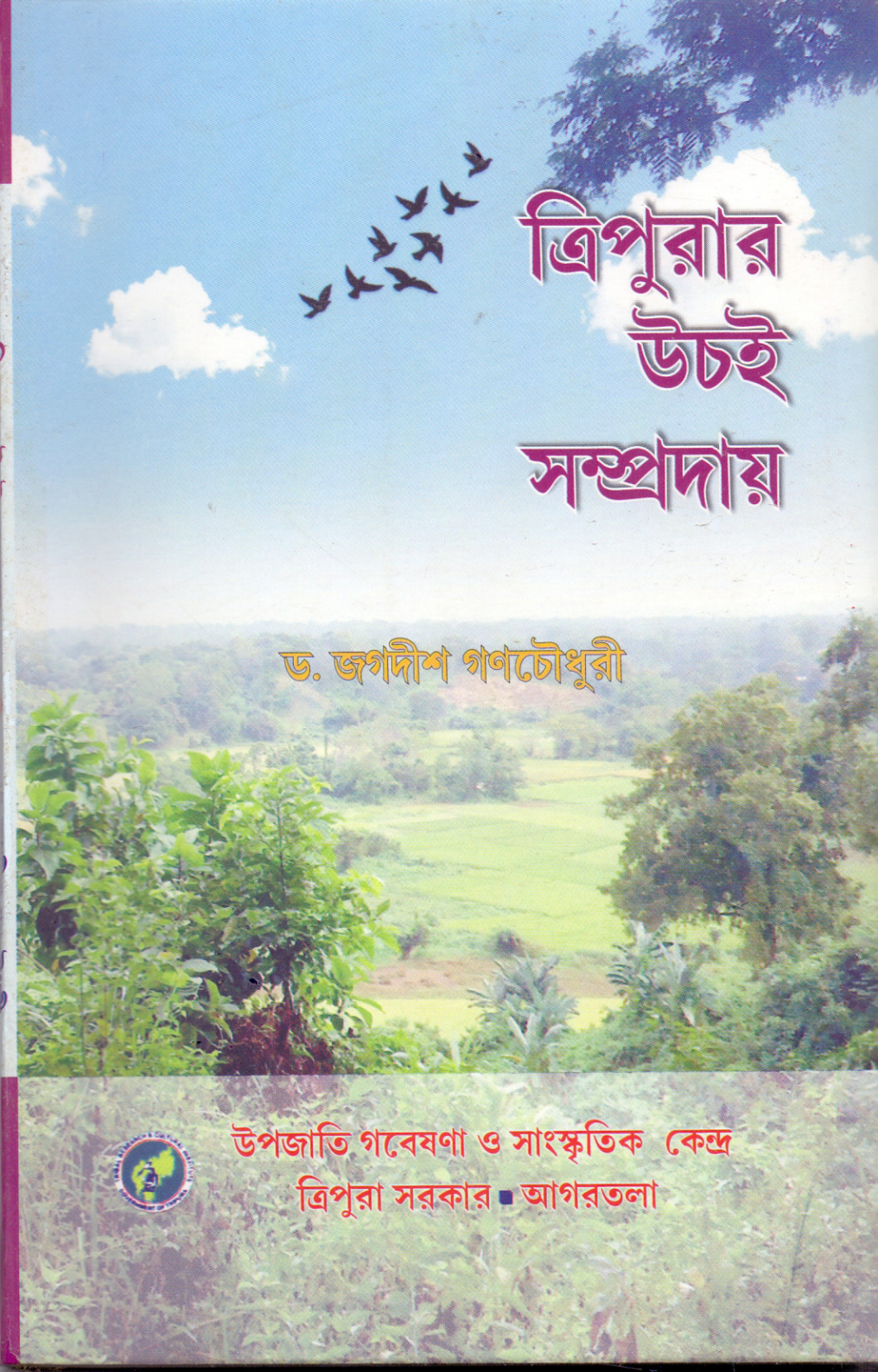

ত্রিপুরার উচই সম্প্রদায়

ড. জগদীশ গণচৌধুরী

উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার ■ আগরতলা

ত্রিপুরার উচই সম্প্রদায়

ডঃ জগদীশ গণচৌধুরী

উপজাতি গবেষণাও সংস্কৃতি কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার
আগরতলা, ত্রিপুরা
২০১৬

মুদ্রণ ইতিহাস
পুস্তকের নাম ঃ ত্রিপুরার উচই সম্প্রদায়
লেখক ঃ ড. জগদীশ গণচৌধুরী

প্রকাশকাল ঃ প্রথম সংস্করণ ২০১৬
প্রকাশক ঃ উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা।

গ্রন্থস্বত্ত্ব ঃ উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র

প্রচ্ছদ ঃ সমর সেন

ISBN - 978-81-932589-7-2

মুদ্রণ ঃ কালিকা প্রেস প্রাঃ লিঃ, আগরতলা

মূল্য ঃ ৮০ (আশি) টাকা

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
ক.	প্রাক্-কথন	...	iv
খ.	উপক্রমণিকা	...	v
গ.	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	...	vii

অধ্যায়			পৃষ্ঠা
১.	পরিবেশ ও পটভূমি	...	১
২.	উচইদের পরিচিতি	...	৬
৩.	অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা	...	১১
৪.	সামাজিক প্রকরণ	...	২১
৫.	ধর্ম ও পূজা-পার্বণ	...	৪১
৬.	অনুশাসন ও প্রশাসন	...	৫১
৭.	রূপান্তর	...	৬০
	গ্রন্থপঞ্জী	...	৬৭
	পরিশিষ্ট	...	৬৯
	আলোকচিত্র	...	৮১

ক. প্রাক্ কথন

উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র-এর প্রকাশনা-ভান্ডারে ডঃ জগদীশ গণচৌধুরী কর্তৃক লিখিত **'ত্রিপুরার উচই সম্প্রদায়'** একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

দীর্ঘকাল রাজন্যশাসিত, বন-জঙ্গল-পাহাড়-পর্বত-সমাকীর্ণ, নিভৃত পল্লী-ত্রিপুরার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার, আর অধুনা গণতান্ত্রিক, দল শাসিত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী, বাস্তববাদী, যন্ত্রপ্রভাবিত জটিল জীবনযাত্রার বর্ণনা, একটি সম্প্রদায়কে উপলক্ষ করে, বর্ণিত হয়েছে এই পুস্তকে।

নৃতত্ত্ব-আশ্রয়ী লেখাতে কল্পনাবিলাসের স্থান নেই; যুক্তি সঙ্গত অনুমানের, মানবিক উদারতার, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির স্থান আছে। উচই সম্পর্কিত পুস্তকটিতে এসব মূল্যবোধের আভাস রয়েছে। তাঁর পরিণত বয়সের চিন্তা-চেতনার ফলিত রূপটি উচই সমাজের ভাবুক মহলকে নাড়া দিতে পারে।

ডঃ জগদীশ গণচৌধুরী হলেন ত্রিপুরা বিষয়ক গবেষণা ক্ষেত্রে সুপরিচিত গবেষক। তাঁর পুস্তকটি সুধীজনের দৃষ্টিগোচর হবে বলে আমাদের আশা ও বিশ্বাস।

এর আগে, শ্রী শ্যামলাল দেববর্মা মহাশয়ের লিখিত ও গবেষণাধিকার দ্বারা প্রকাশিত (১৯৮৩), 'সাধারণ সমীক্ষার আলোকে উচই' পুস্তকটিও পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে।

(সুনীল দেববর্মা)
অধিকর্তা
উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার

আগরতলা
৯ই অক্টোবর, ২০১৬ইং

খ. উপক্রমণিকা

এই নিবন্ধে ত্রিপুরা রাজ্যের একটি ক্ষীণ উপজাতির জীবন ও সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রতিবেদিত হল। সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা ত্রিপুরার প্রতি সুদূর অতীত থেকে বহু লোক আকৃষ্ট হয়েছে। পূর্বদিক থেকে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্রোতে দলে-দলে ত্রিপুর বংশীয় উপজাতিরা এসেছে। পশ্চিমদিক হতে আসে বাংলা ভাষাভাষীরা। এছাড়াও, ভারতের প্রায় সব প্রদেশও প্রান্তের লোক কম-বেশি এখানে আছে। তবে বাঙালি ও ত্রিপুরী এ দু'গোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য সহজে নজরে পড়ে। সুতরাং ত্রিপুরার অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি মুখ্যত এ দু'গোষ্ঠীর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল।

ত্রিপুরায় উনিশটি তপশিলি উপজাতির বাস। তন্মধ্যে ত্রিপুরী সম্প্রদায় সবচাইতে সংখ্যা গরিষ্ঠ, শিক্ষিত, সংগতি-সম্পন্ন ও প্রভাবশালী। প্রায় ১৩০৭ বছর (৬৪২-১৯৪৯) তারা ত্রিপুরায় রাজত্ব করেন। অপরপক্ষে, উচইরা সংখ্যায় একেবারে নগন্য, বনবাসী, নবাগত ও নব-শিক্ষিত। স্মরণীয়কালের মধ্যে ত্রিপুরীদের সাথে উচইদের কখনও বড় রকমের বিরোধ বাধেনি। বরং পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা তিক্ত অভিজ্ঞতা পেয়েছে।

উচইরা ত্রিপুরায় যত না আছে, তার চাইতে বেশি বাস করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ও মিজোরামে। নিজেদের স্বীকারোক্তি অনুসারে মাত্র কয়েক ঘর উচই ত্রিপুরার দক্ষিণ পূর্ব কোণে প্রথম আসে ১৯৩৫ সালে। ১৯৫৬ সালে জাতীয় তপশিলে তাদের নাম যুক্ত হয়েছে। প্রান্ত নিবাসী, সংখ্যালঘু, নিরিবিলি স্বভাবের এই উপজাতির বিবরণ ১৯৬১ সালের ভারতের জনগণনায় লিপিবদ্ধ হয়।

এদিকে ব্রিটিশ প্রশাসক কাপ্তান লেউন (১৮৬৯) সম্ভবত সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী উচইদের সম্বন্ধে কিঞ্চিত উল্লেখ করেন। পরিব্রাজকের ভ্রমণ কাহিনী, প্রশাসকের স্মৃতি কথা, সাহিত্যিকের আত্মজীবনী, *শ্রীরাজমালা* প্রভৃতিতে উচইদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। প্রশাসক ও পণ্ডিতদের মনে এঁদের বিষয়ে জানার আগ্রহ জেগেছে অধুনা।

এমতাবস্থায় উচইদের সম্বন্ধে কিছু লিখতে হলে গবেষককে মুখ্যত নির্ভর করতে হবে ক্ষেত্র-অনুসন্ধান পদ্ধতির উপর। গবেষণার লক্ষ্যবস্তু যে-সম্প্রদায়, তাদের মধ্যে থাকা-খাওয়া, মেলা-মেশা, আস্থা স্থাপন, বিভিন্ন বয়সের লোকের সাথে কথোপকথন, একাধিক গ্রাম দর্শন, বিভিন্ন ঋতুতে গমন, প্রশ্নোত্তর সংগ্রহ, সমগোত্রীয় সংস্কৃতির সহিত তুলনা, ভাষা শিক্ষা, প্রাচীন পুথি পঠন-ইত্যাদি স্বীকৃত পদ্ধতি অবলম্বনে এ নিবন্ধ রচিত হল। তবে এটি বিচিত্রগামী হলেও, সর্বত্রগামী হয়নি।

সংগৃহীত উপকরণগুলোকে মোট সাতটি অধ্যায়ে শ্রেণী-বিন্যাস করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকা সংক্ষেপে আলোচিত হল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে উচইদের পরিচিতি তথা উৎপত্তি, নামকরণ, সংখ্যা, সঞ্চরণ ও ভাষার বৈশিষ্ট্য। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ফলমূল আহরণী বৃত্তি, শিকার, পশুপালন, চাষবাস, শিল্পকর্ম বর্ণিত হল। চতুর্থ অধ্যায়ে খাবার, পানীয়, পোশাক, আবাস, সমাজ গড়ন, বিবাহ ও লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ধর্ম ও পূজাপার্বণ। গ্রাম প্রশাসন ও প্রথাগত বিধান ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সপ্তম অধ্যায়ে উচইদের জীবন-প্রণালীতে রূপান্তর ও কয়েকটি সাধারণ সমস্যা সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে। অবশেষে কয়েকটি সংখ্যাপঞ্জি সংযোজন করা হল। ছবিতে জীবনযাত্রার দৃশ্যরূপটির আভাসমাত্র সূচিত হল।

প্রাসঙ্গিক পুস্তক পরিচয়

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের জীবনপ্রণালী সম্বন্ধে লেউনের লিখিত এ বইটি প্রাথমিক পরিচয় -জ্ঞাপক, প্রাঞ্জল, তথ্যপূর্ণ।

পূর্ব ভারতের পাহাড়-পর্বত থেকে এসে সমতলে লুণ্ঠন, নারীঅপহরণ, নরমুন্ডছেদনের ঘটনাবলি ম্যাকেনজির বইতে লিপিবদ্ধ।

শ্যামলাল দেববর্মা ঃ *সাধারণ সমীক্ষার আলোকে উচই;* আগরতলা, ১৯৮৩। তথ্যপূর্ণ, ইতিহাস সমন্বিত, সুপরিকল্পিত, সুলভ এ-বইটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

দ্বিজ রাম গঙ্গা ঃ *কৃষ্ণমালা,* আগরতলা, ১৯৯৫। এই সুপ্রাচীন গ্রন্থে ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাসের আলেখ্য চিত্রিত। গাজীর আক্রমণের নিষ্ঠুরতা ও কৃষ্ণ মাণিক্যের বনবাস জীবনের করুণ অবস্থা নিপুণভাবে তুলে ধরে লেখক ইতিহাস নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রী অম্বা চন্দ্র উচই ঃ *উচই সামাজিক আইন ও রীতিনীতি,* ২০১১ইং; উচই সমাজের হৃদয় হতে, উচইদের দ্বারা, উচইদের জন্য লিখিত এ-পুস্তিকা সামাজিক আইনের ও প্রশাসনিক চিত্রের এক অনবদ্য প্রমাণপত্র। এ যেন উচই সাহিত্যকুঞ্জে প্রভাতে পাখীর মধুর ডাক।

জগদীশ গণচৌধুরী

গ. কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নৃতত্ত্বের ছাত্র ও গবেষককে বনে বাদারে ঘুরতে হয়। বনবাসীদের দুয়ারে-দুয়ারে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। বনবাসীদের সহৃদয় সহায়তা ছাড়া একাজ দুরূহ। বনবাসীরা সন্দিগ্ধ ও অসহযোগী হলে প্রকৃত তথ্য উৎঘাটন কঠিন। সৌভাগ্যের বিষয়, উচইরা তাদের জাতীয় ইতিহাস-গ্রন্থের অভাব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং একাজে আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে খুশি হয়ে আদর-আপ্যায়ন, উৎসাহ ও তথ্যদান করেছে। এদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ রইলাম।

১) ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে অমরপুরের লেবাছড়া গ্রামে গ্রামবাসীদের সহযোগিতা পেয়েছি। সে-যাত্রা নতুন বাজারের গ্রাম সেবক শ্রী সুনীল বরণ চৌধুরীও যথেষ্ট সাহায্য করেন।

২) ১৯৭৫ সালের জানুয়ারীতে বিলোনীয়া মহকুমার মুহুরিপুরে ও রতনপুরে গেলাম। সেখানে উচইরা তো সাহায্য করলই, অধিকন্তু স্থানীয় শিক্ষক শ্রী অরুণবরণ চৌধুরী তাঁর বাড়িতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রেরণাদাতা শ্রী রাখাল গণচৌধুরী।

৩) ১৯৮২ সালের জানুয়ারীতে অমরপুরে আবার যাই, তখন শ্রী নেপাল রায় ও শ্রী পরিমল ভৌমিক সাহায্য করেন। তিন বোন (নীহারবালা, রমলা, লীলাবতী) দিয়েছেন নীরব সেবা।

৪) অমরপুর মহকুমার বড়বাড়ি নামক উচই পাড়ার গাঁও-বুড়া শ্রী শম্বা রায়চৌধুরীর নামোল্লেখ করতেই হয়। তাঁর বাড়িতেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হল। সময়টা ছিল ১৯৮৩ সালের ১০-১১ই সেপ্টেম্বর।

৫) গত ২২.৮.২০১৬-তে বিলোনীয়ার রতনপুরে উচইপাড়াতে পুনরায় ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজে যানবাহনের সহায়তা পেলাম ডঃ ধনঞ্জয় গণচৌধুরীর কাছ থেকে। সাথী শ্রী ননীগোপাল গণচৌধুরী।

৬) গত ২৮.১০.২০১৬তে অমরপুরের কালাছড়া উচই পাড়াতে যাওয়ার জন্য সহায়তা করেছেন শ্রী স্বপন দেব, শ্রী ধনলা উচই এবং শ্রী সুশীল রিয়াং। ধনলা বাবু সাত্ত্বিক আহার পরিবেশন করেছেন। মাননীয় সমাজপতি শ্রী এরাধন উচই দিলেন প্রশ্নোত্তর।

ছবি তোলার কাজে সাহায্য পেলাম ডঃ নরেন্দ্র গণচৌধুরী, শ্রী প্রসেনজিৎ দাস, গোপা দে'র কাছ থেকে। গ্রন্থাগারিক শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রী সুখময় লোধ ও প্রাক্তন গবেষণা-আধিকারিক শ্রী দেবপ্রিয় দেববর্মণ, ডঃ শঙ্কর রায়, শ্রী ধনঞ্জয় গোপ, ডঃ সুরজিৎ পাল, শ্রী বাসুদেব ভট্টাচার্য, শ্রী চন্দন চক্রবর্তী, শ্রী প্রিয়তোষ সরকার, শ্রী নির্মল মহালনবীস নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন।

সারস্বত সাধনায় শিক্ষাগুরু আচার্য্য ডঃ সুধীররঞ্জন দাশ (১৯১৬-১৯৯৬), গুরুপত্নী শ্রীমতী অমিয়া দাশ এবং তাঁদের কৃতী সন্তান সুরঞ্জন ও সুমিত যে কতভাবে সাহায্য করেছেন তা ভাষায় বর্ণনাতীত। বর্তমানে মাননীয় গবেষণাধিকারিক প্রাক্-কথন লিখে দিয়ে বইটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। শ্রী বিদ্যুৎ কান্তি ধর সংযোজকের ভূমিকা পালন করেছেন ভাল রূপে। শ্রী সমর সেন ও সুমন মোদক বর্ণ সংস্থাপনে পারদর্শিতা দেখালেন।

প্রথম অধ্যায়

পরিবেশ ও পটভূমি

মানব সভ্যতার বিবর্তনে পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য। মানুষের সভ্যতার বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ পরিবেশের তারতম্য। নগরায়ণের ফলে মোটামুটি এক ধাঁচের জীবনযাত্রা গড়ে উঠেছে। কিন্তু এখনও গিরি-কন্দরবাসী জনজাতির জীবনে পরিবেশের উপরে নির্ভরশীলতা অনেক পরিমাণে। তাদের আর্থিক বৃত্তি, পোশাক, ঘরবাড়ি, আচার-বিশ্বাস পরিবেশ-নির্ভর।

মৎস্য শিকারজীবী সুমেরু নিবাসী এস্কিমোদের নিকট জলদেবী সেদনা এবং বঙ্গোপসাগরের তীরবাসী নুলিয়াদের নিকট চণ্ডী ও গঙ্গাদেবী যতটা গুরুত্বপূর্ণ, পূর্ব ভারতের বনবাসীদের নিকট জলদেবীর গুরুত্ব ততটা নয়। ত্রিপুরার বনবাসী তিপ্রা, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, উচইদের মনে বনদেবতা বুড়াছা-হাইচুকমা যতটা স্থান দখল করে আছে, মরুভূমি নিবাসী আরব বেদুইনদের নিকট এক শতাংশও নেই। পরিবেশগত কারণেই এস্কিমোদের ঘর তৈরির উপকরণ ও নমুনা এবং লুসাই-কুকিদের ঘর তৈরির উপকরণও নমুনা ভিন্ন। ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট নিবাসী

রাখাল বালকেরা বাঘের উপদ্রব থেকে গো-বাছুর রক্ষার্থে বাঘাই নামে এক গ্রাম্য দেবতার পূজা করত। চারিদিকে রাস্তাঘাট হওয়ায় এবং বনজঙ্গল কেটে জনবসতি স্থাপিত হওয়ায় বাঘ উধাও হল, বাঘাই দেবতার পূজাও হ্রাস পেতে বসেছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের মত সামাজিক পরিবেশও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। এক গোষ্ঠীর লোক অন্য এক গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এলে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। সহযোগিতা ও সংঘর্ষ এই উভয়বিধ সম্পর্ক গড়ে উঠে। বস্তুর ও ভাবের আদান-প্রদান হয়। সরল সংস্কৃতি ও জটিল সংস্কৃতি পরস্পরের সান্নিধ্যে এলে, সরল সংস্কৃতি জটিল সংস্কৃতি থেকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় স্থূল বস্তু নেয়। ক্রমে সূক্ষ্ম বিষয় নিতে থাকে। কিছুদিন পর সরল সংস্কৃতির মনে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, নিজের সম্বিৎ ফিরে আসে, ধার করা উপাদান ঝেড়ে মুছে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে চায়। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বনির্ভরতা প্রায় অসম্ভব। পুরাতনের আর নতুনের সমন্বয়ে এক সংকর সংস্কৃতি জন্মলাভ করে। এই সংমিশ্রণ আধুনিক যুগে আরো বেশি হতে বাধ্য। সামাজিক পরিবর্তনের গতি আগে ছিল মন্থর, এখন দ্রুত। একক, নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষে অসম্ভব। এমনকি মহাসমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপে গিয়েও নয়। অন্ন, আবাস, আভরণ এবং আরো অনেক কিছুর জন্য অন্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা অত্যাবশ্যক।

পারিপার্শ্বিক ধ্রুববাদকে মানব সংস্কৃতি ব্যাখ্যার একমাত্র চাবিকাঠি মনে করা ঠিক নয়। সংস্কৃতির রূপায়ণে পরিবেশের প্রভাবকে অসীম বলা যায় না। তাই যদি হত তবে এক পরিবেশে সম্পূর্ণ একরূপ জীবনযাত্রা গড়ে উঠত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় একই পরিবেশে বসবাসী নরগোষ্ঠীর মধ্যে আচার ব্যবহারের হেরফের আছে; উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় সুমেরু নিবাসী চাকচী ও এস্কিমোদের চাল-চলন একটু ভিন্ন ধরণের, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তনিবাসী পুয়েব্লু এবং নবহোদের আচার-অনুষ্ঠান পৃথক-পৃথক। পূর্ব ভারতের পর্বতবাসী খাসিয়া, গারোরা মাতৃতান্ত্রিক; অথচ প্রতিবেশী নাগা,মিজো, তিপ্রারা পিতৃতান্ত্রিক।

পরিবেশের প্রভাবকে একেবারে নাকচ করা যায় না। তাই এই অধ্যায়ে প্রতিবেদিত হল ত্রিপুরার প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকা।

১. প্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ ত্রিপুরা ভারতের অন্যতম অঙ্গরাজ্য। অবস্থান আসাম ও বাংলাদেশের মধ্যে। আয়তন মাত্র ১০,৪৯১.৬৯ বর্গ কিমি। মানচিত্রে ইহাকে অনেকটা বাংলা ৫-এর মত দেখায়। তিন দিক থেকে বাংলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত।

ত্রিপুরা পার্বত্য এলাকা। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার উত্তরপ্রদেশে যোজনের পর যোজন বিস্তীর্ণ সমতল মাঠ আছে। তেমন মাঠ এখানে বিরল। ছয়টি বড় পর্বতমালা ছাড়াও আছে অসংখ্য অপেক্ষাকৃত ছোট-ছোট টিলা। দশটি দীর্ঘ নদী ব্যতীতও আছে অসংখ্য উপনদী। আছে ছোট বড় বহু সরোবর এবং উপত্যকা।

আসাম, বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার জলবায়ু অভিন্ন। মৌসুমী বায়ুর গতিপথে ত্রিপুরা অবস্থিত। দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর থেকে আগত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০ সেমি-এর কম নয়। বাংলার ষড় ঋতু এখানেও সমভাবে উপলব্ধ হয়। ঝড়, তুফান, বিদ্যুৎ চমক, রামধনু, ভূমিকম্প, শিলাবৃষ্টি প্রবল এবং

আদিবাসী সমাজের বহু রূপকথার অন্যতম উৎস। এ অঞ্চলের ঋতুচক্র যেন বীণার ছয়টি তার।

ত্রিপুরার মাটি উর্বর। ঘন বৃষ্টিপাত। ফলে নাম না জানা বহু বিচিত্র ধরণের বাঁশ, গাছ-গাছড়া, লতা-গুল্ম, ঘাস দেখতে পাওয়া যায়। চিরহরিৎ বনালীর শ্যামল শোভা মনলোভা। তেমনি আছে হাজারো রকমের পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, সাপ, সরীসৃপ। অমরপুরে এখনো হাতী আছে। নদীর ও হ্রদের জলে নানা জাতের মাছ। খাদ্য আহরণী বৃত্তিধারীদের নিকট ত্রিপুরা ভূস্বর্গ। কম শ্রমে অধিক ফলন হয়। জীবনযাত্রা সহজ। চিন্তায়, লোক বিশ্বাসে, রূপকথায় কল্পনা-বিলাস বেশি। এস্কিমো বা আরব বেদুইনদের মত প্রতিনিয়ত প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে হয় না। এখানে উদর তৃপ্তির জন্য জীবনের অধিকাংশ শক্তি ও সময় ব্যয় করতে হয় না।

২. সামাজিক পরিবেশ ঃ উচইরা নির্জন, নিঃসঙ্গ দ্বীপবাসী নয়। এদের চারিদিকে নানা বংশের বর্ণের ও ধর্মের লোকের বাস। আছে সরকারি প্রশাসনের কল্যাণী হাত। অধিকন্তু রয়েছে বিভিন্ন দল, উপদল, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন-সমিতি। ত্রয়দশ শতাব্দীর ত্রিপুরায় সরকারি কার্যালয়, কর্মচারী, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, বিদ্যার্থী, রাস্তাঘাট ও দোকানপাটের সংখ্যা হাতে গোনা যেত। এখন অসংখ্য, যত্র-তত্র। এসবের প্রতি উচইরা নীরব, নির্বিকার দর্শক নয়।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা লাভ ও ভারত বিভাগের পর, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্যাতিত বনবাসী ও সমতলবাসী হিন্দুরা নিকটবর্তী ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। তবে বনবাসীদের চাইতে সমতলবাসী বাঙালি শরণার্থী হিন্দুদের সংখ্যাই বেশি। তেমনি অনেক মুসলমানও বিক্রয়-বিনিময় করে ভাটিদেশে নেমে পড়েছে। জনগণনার হিসাবে দেখা যাবে এক কালের ক্ষমতাসীন সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতিরা রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনের পর আনুপাতিক হারে ক্রমহ্রাসমান। এর প্রধান কারণ বিপুল সংখ্যক হিন্দু শরণার্থীর আগমন। কিন্তু এর মানে এ নয় যে আন্দামান-নিকোবর নিবাসী ওঙ্গে জরোয়াদের মত এদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হচ্ছে না। বরং বিপরীত। এদের বৃদ্ধি সারা ভারতের জাতীয় বৃদ্ধির হারের চাইতে বেশি।

পরাক্রমশালী ত্রিপুর রাজারা যুদ্ধ বিগ্রহ করে মধ্যযুগের গোড়ারদিকে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু পরে, বঙ্গে মুসলমানরা শক্তিশালী হয়ে, পার্শ্ববর্তী শ্রীহট্ট, আসাম, নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার দিকে লোলুপ দৃষ্টি দেয়। ফলে ত্রিপুরার সীমানা সংকোচিত হল। ১৮৫৪ সালে ত্রিপুরার পশ্চিম সীমানা, যা ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত, নির্ধারিত হল। ১৯৪৭ সালে চাকলা রোশনাবাদ নামে একটি সমতল উর্বর বিশাল (৫৫৮৪৭ বর্গমাইল) এলাকা (নোয়াখালি, কুমিল্লা ও শ্রীহট্টের অংশ নিয়ে গঠিত), যা ছিল ত্রিপুরার অবিচ্ছেদ্য অংগ, হাতছাড়া হয়ে গেল। আঠারশ সত্তরের দশকে কুকি অত্যাচার দমনের নামে ত্রিপুরার আরেকটি অংগ (যা অধুনা মিজোরাম নামে পরিচিত) বেহাত হল। দেশ বিভাগের পর মহারাজের চাকলাবাসী হিন্দু প্রজারা ত্রিপুরাতেই আশ্রয় নিল। এই চাকলা রোশনাবাদই ছিল ত্রিপুরার রাজাদের আয়ের প্রধান উৎস। ত্রিপুরার আয়ের সিংহভাগ আসত চাকলা থেকেই। স্বাধীনতার পর সে-আয় তো গেলই, অধিকন্তু সেখানকার নাগরিকরা এখানকার ভূমির ওপর চাপ সৃষ্টি করতে বাধ্য হল।

অতীতে লোকসংখ্যা পাতলা থাকায়, আধা যাযাবরীয় বৃত্তিধারী উপজাতিরা খুশিমত যেখানে-

সেখানে জুম চাষ করতে পারত। লোকসংখ্যার ঘনত্ব বিংশ-শতকে দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় তাতে বাধা পড়তে লাগল। আর্থিক অসুবিধা ও অসন্তোষ থেকে রাজনৈতিক অসন্তোষ দানা বাঁধছে।

ত্রিপুরাবাসীরা প্রধানতঃ পাঁচটি ধর্মে বিভক্ত যথা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম ও ঈশাই।

ত্রিপুরায় ১৯টি তফশিলি উপজাতির বাস। আগমনের সম্ভাব্য সময়, সংখ্যা, প্রভাব, আর্থিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন, তিপ্রাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ, অথচ ভূটিয়ারা একশতের কম। সাঁওতাল, ওরাও, মুণ্ডারা বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে আনীত হল চা-বাগানের কাজে। এদিকে হালাম, কুকিরা কয়েক শ' বছর আগে স্বেচ্ছায় আসে। মগ, চাকমারা বৌদ্ধধর্মী; জমাতিয়া ও রিয়াংরা বৈষ্ণব ধর্মী।

১৯৭১ সালের জনগণনা অনুসারে মাত্র ১০.৪৩ শতাংশ লোক এখানকার নগরে বাস করে। এখানে একটি মাত্র মহানগর, রাজধানী আগরতলা। এছাড়া ২৩টি মহকুমা নগর। আকারে এগুলো বাজার সদৃশ। ত্রিপুরায় মন্থর নগরায়ণের অন্যতম কারণ অনুন্নত যোগাযোগ ও শিল্পায়ন। কিন্তু এর চাইতেও বড় কারণ এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ। ত্রিপুরার প্রায় সর্বত্র সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা। নগরের চাইতে গ্রাম অধিক শান্তিদায়ক। মধ্য ভারতের রুক্ষ, শুষ্ক উষ্ণ আবহাওয়ায় কোথাও শহুরে পরিবেশ গড়ে উঠলে, চারিদিক থেকে লোক ছুটে যায় নগর জীবনের সুযোগ সুবিধা পেতে। ত্রিপুরায় সে তাগাদা নেই। নগরবাসীদের মাত্র শতকরা ১.২৩ ভাগ লোক উপজাতীয়। এদের অধিকাংশই রাজবংশীয় দেববর্মণরা। অর্থাৎ উচইদের প্রায় সকলেই গ্রামবাসী। কিন্তু নগর জীবন সম্বন্ধে তারা একেবারেই অজ্ঞ নয়। নগরে তাদের ঘনঘন যাতায়াত আছে। তারা নাগরিক সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত নয়।

৩. ঐতিহাসিক পটভূমিকা—

ত্রিপুরার প্রান্তবর্তী তিতাস নদী ও মেঘনা নদী প্রায় সমান্তরাল ব্যবধানে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে, তিতাস মেঘনাতে মিশেছে, মেঘনা বঙ্গোপসাগরে মিশেছে নোয়াখালীর ভেতর দিয়ে। এ-অঞ্চল অপেক্ষাকৃত সমতল, লাঙ্গলচাষ-উপযোগী ও নাব্য। সমতল চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শ্রীহট্ট প্রভৃতি বিশাল জনপদ এ-ভূভাগেই অবস্থিত। এ-ভূভাগেই ১৮৮ গুপ্তাব্দে (৫০৭ খৃষ্টাব্দে) মহারাজ বৈন্য গুপ্ত তাম্রশাসন দ্বারা ভূমিদান করেছিলেন। গুপ্ত শাসন কালের (৩২০-৫৫৫ খৃ) পর, অন্যত্র যেমন, এ-অঞ্চলে ছোট-ছোট রাজবংশ গড়ে উঠল, যেমন ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশ, রাত বংশ, খড়্গ বংশ, দেব বংশ, চন্দ্র বংশ, বর্মন বংশ, পাট্টিকরাএর বংশ, দেব বংশ। এসব বংশ যুগপৎ শাসন করে নি। একটির অবসানের পর পরবর্তী বংশ শাসন করেছিল।। ১২০৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের রাজা লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৪) বিদেশি, বিধর্মীর হাতে পরাভূত হয়ে নিকটস্থ ঢাকা বিক্রমপুরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অতঃপর, সমগ্র বঙ্গদেশের নাভিশ্বাস শুরু হল তুর্কী-তান্ডবে। ওদের পৌষমাস, মোদের সর্বনাশ!

সে-সময়ে ত্রিপুরার আশা-ভরসার মহীরূহ ছিল ত্রিপুর রাজবংশ, এ-বংশের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাসঙ্গিক। এ-বংশ মুখ্যত তিনটি উপত্যকায় অবস্থান করে, রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে প্রজা পালন করেছিল। বরাক উপত্যকাতে (৬৪২-১২৮০), গোমতী উপত্যকাতে (১২৮০-১৭৪৭) এবং হাওড়া উপত্যকাতে (১৭৬০-১৯৪৯) অবধি।

বরাক উপত্যকাতে প্রায় বিশ জন নৃপতি রাজত্ব করেন। ত্রিপুর কুলপতি আদি ধর্মফা (আঃ৬৩৫-৬৭৫) কর্তৃক আয়োজিত বিশাল যজ্ঞ হল এক ঐতিহাসিক ঘটনা; হোতা পঞ্চগোত্রীয় মৈথিলী ব্রাহ্মণকে মাঘী পূর্ণিমা, ৫১ ত্রিপুরাব্দে (জানুয়ারী ৬৪২) পঞ্চখন্ড ভূমিদান সূচনা করল নবজাগরণ, সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার।। বহু বৎসর পর রাজা ধর্ম ধর (আ ১১৬০-১২২৫) বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া ৬০৪ ত্রিপুরাব্দে (১১৯৪ খৃ) আরেক বিশাল যজ্ঞ করালেন; হোতা ছিলেন নিধিপতি। কিন্তু ১২৪০ খৃষ্টাব্দে অত্যাচারী হীরাবন্ত খান বনাম ছেংথুমফা (আ ১২২৫-১৩৫০) যুদ্ধ বিপর্যয় ঘটাল। ইয়েমেনবাসী শাহ জালালের শ্রীহট্টে আগমণ বিপৎকে তরান্বিত করল। স্থানত্যাগী, উদ্বাস্ত রাজা ও প্রজারা এল গোমতী উপত্যকাতে।

গোমতী উপত্যকাতে প্রায় চল্লিশ জন রাজা সুখে-দুঃখে রাজত্ব করেন প্রায় সাড়ে চারশত বৎসর। এ-সময় বিদেশীয় আক্রমণের ধারা শ্রাবণের ধারার মত বর্ষিত হয়েছিল। এ সময়ের পরাক্রমশালী কতিপয় নৃপতির নাম হল মহারাজ ধন্য মাণিক্য (আ ১৪৯০-১৫১৫), মহারাজ বিজয় মাণিক্য (আ ১৫২৮-১৫৬৩), মহারাজ অমর মাণিক্য (আ ১৫৭৭-১৫৮৬), মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য (আ ১৬২৬-১৬৬০)। তখন প্রশাসনের চরিত্র ছিল যুদ্ধ কেন্দ্রিক। ত্রিপুরী সৈন্য, রিয়াং সৈন্য, জমাতিয়া সৈন্য এবং বাঙালী লস্কর সৈন্য দেশ রক্ষা করতে বারে বারে রণক্ষেত্রে গিয়েছিল এবং অনেকেই রণাঙ্গনে নিহত হয়েছে। এ-পর্বের অবসান ঘটাল অত্যাচারী সমসের গাজী। আক্রান্ত রাজপরিবার হল পূর্বকূলে বনবাসী; প্রজারা হল অনাথ, দিশেহারা! এ সময়ের রাজা কৃষ্ণ মাণিক্য (১৭৪৭-১৭৮৩) প্রায় বার বৎসর (১৭৪৭-১৭৫৯) বনবাস জনিত যন্ত্রণা ভোগ করেন; গোমতী উপত্যকার রাজধানী ছাড়েন।

কৃষ্ণ মাণিক্য অবশেষে হাওড়া উপত্যকাতে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে রাজবাড়ী নির্মাণ শুরু করেন। অপরদিকে ২৩ জুন ১৭৫৭তে পলাসীর যুদ্ধ রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিল। হাওড়া উপত্যকাতে থাকাকালীন ১৮৯ বৎসরের (১৭৬০-১৯৪৯) রাজত্বকালে প্রশাসনের চরিত্র ছিল উন্নয়ন ও সংস্কার কেন্দ্রিক। এখানে মাত্র বারজন রাজা রাজত্ব করেছিলেন। তাও, ১৯৪৭-৪৮ সালের দমকা হাওয়াতে ঝড়ের বেলায় জীর্ণ পাতার দশা হয়েছিল ত্রিপুরার।

ইতিহাসের এই রূপরেখা উচই সম্প্রদায়ের ইতিহাস রচনার সহায়ক। ত্রিপুরার ঘন ঘোর দুর্যোগের সময় ত্রিপুরী, রিয়াং, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, উচই প্রভৃতি সমাজের একাংশ আশ্রয় নিয়েছিল দুর্গম পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে। বিদেশী আক্রমণের ভয় কমে গেলে, তারা ত্রিপুরায় প্রত্যাবর্তন করতে থাকে। ১৯৪৭-৪৮ এর দাঙ্গা হাঙ্গামা বশত অনেকেই দ্রুত এখানে আশ্রয় নিল।

কিন্তু ইতিহাসকে এখানেই ইতি টানা ঠিক হবে না। কতিপয় দক্ষ বাজিকরে নাচায় নরে! যুবাদের বিভ্রান্ত করার তরে। স্বাধীনতা-উত্তর অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস উদ্বাস্তু বিরোধী রক্তাক্ত ইতিহাস, উগ্রপন্থার ইতিহাস। বাঙালী হিন্দু উদ্বাস্তুরা ত্রিপুরার পূর্ব প্রান্তীয় প্রত্যন্তর বনে-বাদারে উপনিবেশ সম্প্রসারণ করে গুরুতর ভুল করেছিল। পূর্ব ভারতে Liberation Army গঠন করা যেন মহামারী রোগের মতো ছড়িয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উচইদের পরিচিতি

১. নামকরণ

আত্মপরিচয় ঃ উচই সম্প্রদায় নিজেদিগকে ব্রুং বলে পরিচয় দেয়। ব্রুং শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করলে দেখা যায় ইহা তিব্বত-বর্মি ভাষার বোরো উপভাষান্তর্গত শব্দ যার মানে মানুষ। স্মরণ করা যেতে পারে যে রিয়াং সম্প্রদায় নিজেদের ব্রু বলে দাবি করে। তিপ্রারা নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের সময় নিজেদিগকে বরক বলে যার অর্থ একই, মানুষ। প্রায় একই শব্দ ব্যবহার করে নোয়াতিয়া এবং জমাতিয়া সম্প্রদায়। সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে মিকির, গারো, লুসাই উপজাতি।

উচইরা নিজেদিগকে ব্রুং বলে পরিচয় দিলেও, উচই এই নামকরণই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই নামকরণ হওয়ার পশ্চাতে একটি ছোট কাহিনি আছে। এই কাহিনি অনুসারে উচই ও রিয়াং সহোদর

ভাই, তিপ্রা বংশজাত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম নিবাসী। সুদূর অতীতে এক তিপ্রা পরিবারের দু'ভাই সপরিবার ভাগ্যান্বেষণে আরাকান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হয়। দু'ভাইয়ের নাম উত্তর পুরুষরা ভুলে গেছে। যাত্রাপথে তারা নদী-নালা-পাহাড়-পর্বত অনেক অতিক্রম করেছে। বেলা যখন দুপুর, তখন শংখ নদীর তীরে তারা পৌঁছে। খাবার সময় হল। দু'ভাই নদীতে নামল। জ্যেষ্ঠ ভাই পেল একটি গলদা চিংড়ি, কনিষ্ট ভাই পেল ছোট ছোট চিংড়ি, ইচা মাছ। উভয়ের পরিবার পৃথক-পৃথক রান্না করল। মাছ ধরে, স্নান করে, রেঁধে খেয়ে আবার পথ চলতে থাকলো। ছোট ভাই আগেই খাওয়া-দাওয়া সেরে এগুতে থাকল। বড় ভাইয়ের রান্না ও খাওয়া সারতে একটু বেশি সময় লাগায় পিছিয়ে পড়ল। বড়ভাই হাটতে-হাটতে রেংতই নদী অবধি এল। আরেকটু সামনে যেতেই ছড়া। পশ্চাদবর্তী বড়ভাই কাতর স্বরে ডাকছে, কাঁদছে। কিন্তু আর দেখা পেল না অগ্রবর্তী ছোট ভাইয়ের। উচইদের কথ্যভাষায় পশ্চাদগামী যে-কেউকে বলে উলসা, অগ্রগামীকে রিয়াংসা। লোক বিশ্বাস উচইরা সেই পশ্চাদবর্তী বড় ভাইয়ের বংশধর এবং রিয়াংরা অগ্রগামী ছোট ভাইয়ের।

২. জনসংখ্যা

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের আদেশমূলে ত্রিপুরায় স্বীকৃত ১৯টি উপজাতির তালিকায় উচইরা স্থান পেয়েছে (কে ডি মেনন, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৩)

জনসংখ্যার দিক থেকে ত্রিপুরার ১৯টি উপজাতির মধ্যে উচইদের স্থান চতুর্দশ। স্থানীয় উচইদের মতে, ত্রিপুরায় যত সংখ্যক উচই আছে, তার চাইতে ঢের বেশি আছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। পার্বত্য চট্টগ্রাম নিবাসী উচইদের সঠিক সংখ্যা পাওয়া কষ্টসাধ্য। লৌকিক অনুমান, পনেরো হাজারের কম নয়। ত্রিপুরার দুর্গম পাহাড়ের এককোণে ১৯৩৫ সাল নাগাদ এলেও, মাত্র ১৯৬১ সনের জনগণনায় প্রথম তাদের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করা হয়। ১৯৪১ এবং ১৯৫১ সনের জনগণনায় তারা বাদ পড়ে যাওয়ার কারণ একাধিক, যথাঃ- উচইদের সংখ্যাল্পতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত পরিস্থিতি, পঞ্চাশের গোড়ায় আন্দোলনজনিত ভয়াবহতা, জনগণনা বিভাগের সীমিত আয়োজন, ইত্যাদি। পরে ১৯৬১ থেকে ২০১১ সনের জনগণনার পরিসংখ্যান দেয়া হল পরিশিষ্টে।

৩. বন্টন

উচইরা এক পাড়ায় সকলে যেমন নেই, তেমনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যেও নেই। মাত্র তিনটি মহকুমায় এদের বাস। অমরপুর, বিলোনীয়া ও ধর্মনগর। অসমভাবে বন্টিত এদের সংখ্যা। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে ও মিজোরামে কয়েক হাজার উচই বাস করে।

মহকুমা ভিত্তিক বসতি উচইদের আগমনের সম্ভাব্য পথের সূত্র নির্দেশ করে। অমরপুর, বিলোনীয়া ও ধর্মনগর মহকুমা পার্বত্য চট্টগ্রাম সংলগ্ন। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে এসে নিকটবর্তী ত্রিপুরার মহকুমাগুলোতে তারা বসতি স্থাপন করেছে।

৪. নরগোষ্ঠীগত সম্পর্ক

উচই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও আদি ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমিত, তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়-পত্র খুবই কম। তারা কোন্ নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে মাপ-জোখ হয়নি। লোক স্মৃতির ঐতিহাসিকতা সন্দেহাতীত নয়।

এমতাবস্থায় উচইদের নরগোষ্ঠিক পরিচয়ের প্রশ্নের সমাধান কঠিন কাজ। নৃতত্ত্ব এই পৃথিবীর যাবতীয় মানুষকে তিনটি প্রধান নরগোষ্ঠীতে এবং বহু উপগোষ্ঠীতে ভাগ করেছে। তিনটি মুখ্য বিভাগ হল—ককেসীয়, নিগ্রো ও মঙ্গোলীয়। চীন, মঙ্গোলিয়া, বার্মা, পূর্ব ভারত, জাপান, কোরিয়া, শ্যামদ্বীপ, যবদ্বীপ, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে মঙ্গোলীয়দের ঘনবসতি আছে। এদের চোহারা সুঠাম ও মধ্যমাকৃতি, রং পীতবর্ণ, মাথা ও মুখ চ্যাপটা, চোখের পাতিতে ভাঁজ, গোফ দাড়ি কম, চুল খাড়া, মোটা ও সরল।

বলা বাহুল্য, মঙ্গোলীয়দের এসব সাধারণ বহিরাকৃতিগত লক্ষণ উচইদের মধ্যেও বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, যে রিয়াংদের সাথে তাদের নিকটতম সম্পর্ক আছে বলে দাবি করা হয়, সেই রিয়াংদের সম্পর্কে মিত্র মহাশয় নৃতাত্ত্বিক গবেষণা চালিয়ে প্রমাণ করেছেন রিয়াংদের মঙ্গোলীয় পরিচয়। অধিকন্তু, তিপ্রাদের সাথেও তাদের সম্বন্ধ দূরের নয়। বর্তমান গবেষক তিপ্রাদের গোষ্ঠী পরিচয় সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করেছে। উভয় সম্পর্কের ভিত্তিতে বলা যায়, উচইরা মঙ্গোলীয়। তদুপরি, উচইদের ভাষা, লোকগাথা, পোশাক, জীবিকা, সঞ্চরণ, বিচরণ প্রভৃতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতেও অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে উচইরা মঙ্গোলীয়।

৫. সঞ্চরণ ও বিচরণ

ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম, মিজোরাম উচইদের বর্তমান বাসভূমি। কিন্তু, এ অঞ্চলে স্মরণাতীত কাল থেকে তারা বাস করে আসছে না। অন্য কোনো খান থেকে তাদের আগমন হয়েছে। এ বিষয়ে শ্যামলাল বাবু বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

উচইরা মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত শাখা প্রশাখা বিশেষ। সুতরাং পূর্ব ভারতের বসবাসকারী অন্যান্য মঙ্গোলীয়দের অতীতের ইতিহাস এবং উচইদের অতীতের ইতিহাস মোটামুটি এক। এ বিষয়ে কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতামত এক্ষেত্রে প্রণিধান যোগ্য ঃ-

গ্রিয়ারসন (১৮৫১-১৯৪১) ভারতের ভাষা-সমীক্ষা (১৯২৭) করতে গিয়ে এ ধারণায় উপনীত হন যে সিনো-তিব্বতীয় ভাষাভাষিদের আদি নিবাস চীনের ইয়াং-সিকিয়াং নদীর তীরে ছিল। গ্রিয়ার সনের কথায়—

"The Tibeto-Barmans migrated from their original seat on the upper courses of the Yangtse and the Hoangho towards the headwaters of the Irrawaddy and of the Chindwin"

অনুসন্ধিৎসু ব্রিটিশ প্রশাসক এলেন, গেইট, এলেন ও হাওয়ার্ড একমত হয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন—

"... in the main, Assam has drawn its inhabitants from the vast hive of the Mongolian race in western China, which in very recent times threw off a series of swarms that afterwards found their way into the frontier lands of India; some to the west, ascending the Isan-Po or upper course of the Brahmaputra and some along the northern slopes of the Himalayas, some to the south, down the courses of the Chindwin, Irrawaddy, Salween, Menam and Mekong rivers, peopling Barma, Siam and the adjoining countries and some to the south-west, descending the Brahmaputra to Assam and thence far into Bengal"

ভারতের প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় (১৯৫০) প্রায় একই সুরে বলেন—

"The area of characterization for the primitive Sino-Tibetan speech appears to have been north-western China between the headwaters of the Huang Ho and the Yang-Tsze kiang rivers. Possibly very early off-shoots of the prot-sino-Tibetan speaking Mongoloids, before the language was fully characterized, came down to south China and Burma....

বড়কাতকি (১৯৬৯) আরো স্পষ্ট ভাষায় বিভিন্ন জনস্রোতের আগমনের সম্ভাব্য ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—

"All that we can say with certainty is that from about 2000 B.C. there was a movement of Mongoloid populations from the north to India through Assam and these people along with others who migrated from northern Burma formed, from the remote past, the bulk of the population of Assam... There were apparently wave after wave of these migrations and the invaders belonged to the Indo-Chinese linguistic family, of which the two most important sub-families are the Mon-khmer and the Tibeto-Burman. The third, Siamese Chinese, includes Shan, which was spoken by the Ahoms, the last of these invaders. The Mon-khmer speakers appear to have come earlier than the others. They are apparently driven by subsequent Tibeto-Burman hordes into the Khasi Hills, which is the only part of Assam in which the sub-family now exists. Of the Tibeto-Burman sub-family, there were three groups, viz. Naga, Kuki-Chin and Bodo. The Naga and Kuki

speakers were driven to the hills and Bodo became the prominent language. It includes all the surviving non-Aryan languages of the plains, the Garo Hills and the North Cachar Hills. Kachari, Mech, Garo, Dimasa, Tipra, Lalung and Chutiya are derivations of Bodo.

ভারতের উত্তর-পূর্ব কোণের উপজাতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা প্রায় সকলেই একমত যে, এ-অঞ্চলের অধিকাংশ উপজাতির আদি নিবাস ছিল চিন দেশের ইয়াং সিকিআং ও হোয়াংহো নদীর উৎসমুখের পার্বত্য অঞ্চলে। খ্রিস্টপূর্ব কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই দলে-দলে, দফে-দফে সাংফু তথা ব্রহ্মপুত্র নদীর তীর ধরে-ধরে তারা উত্তর-পূর্ব ভারতে আগমন করে। তারা যে খ্রিস্টপূর্ব কয়েক হাজার বছর আগেই ভারতের মাটিতে খুঁটি গেড়েছে তার অন্যতম প্রমাণ প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থে এদের সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। যে সকল সম্ভাব্য কারণে তারা এদেশে আসে, তন্মধ্যে সম্ভাব্যগুলো হল— নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, খাদ্যাভাব, চারণ চাষ যাযাবর জীবন, চরম আবহাওয়া। ভারতের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, উর্বর ভূমি, সমৃদ্ধ বনজ সম্পদ ও সবুজ মাঠঘাট ভালো লেগে গেল। আর প্রত্যাবর্তন করল না ঐদেশে। একদিনে, একটি কারণে, একদফে তারা আসেনি। ক্রমে-ক্রমে আসাম, অরুণাচল, মণিপুর, নাগাভূমি, মিজোরাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, ব্রহ্মদেশ, আরাকান, পার্বত্য চট্টগ্রাম, উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গের কিয়দংশ ছেয়ে গেল এদের দ্বারা।

৬. ভাষা

উচইরা বর্তমানে বহু ভাষাবিদ। মাতৃভাষা উচই ছাড়াও বাংলা ভাষায় অনর্গল বলতে পারে প্রায় সকলেই। শিক্ষিত উচইরা উচই উপভাষা, বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি প্রভৃতি জানে। উচইদের মাতৃভাষা উচই বা কক ব্রুং বা কক বরক নামে পরিচিত। আক্ষরিক অর্থে কক ব্রুং বা কক বরকের মানে হল মানুষের ভাষা। কক=ভাষা, ব্রুং বা বরক=মানুষ।

উচই উপভাষার সহিত তিপ্রা, রিয়াং, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কথিত মাতৃভাষার নিকট সাদৃশ্য আছে। গারো, হালাম, লুসাই, কুকি ও মিজোদের ভাষার সহিত দূর-সম্পর্ক থাকতে পারে। বোরো, কাছারি, হাজং, ডিমাসা, ছুটিয়া প্রভৃতি আসাম-নিবাসী উপজাতিদের ভাষার সাথে এদের ভাষার মিল থাকা স্বাভাবিক।

ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে এ-সব উপজাতিদের উপভাষাগুলো সিনো-তিব্বতী ভাষা পরিবারের অন্তর্গত বোরো শাখা-প্রশাখা বিশেষ। সান্নিধ্যের অভাবে এবং দূরত্বের ফলে উপভাষাগুলোর নিজেদের মধ্যে উচ্চারণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পরিবেশের প্রভাবে এসব উপভাষাতে বন্য জীবজন্তু, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, লতাগুল্ম সম্বন্ধীয় শব্দের প্রাচুর্য বিদ্যমান। প্রতিবেশী বাংলা ভাষা থেকে অনেক শব্দ আহরণ ও স্বাঙ্গীকরণ করেছে তারা। সম্প্রতি, অনেক পাশ্চাত্য শব্দও অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা

উচইদের আর্থিক বৃত্তি আদিম অর্থনীতির অন্যতম উদাহরণ। বৃত্তির বিশেষীকরণ অনুপস্থিত। প্রত্যেকেই প্রত্যেক কাজ জানে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ কেউ নয়। ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সংখ্যায় কম, সরল ও অ-কুশল। তাদের চাহিদা সকলের একরূপ, সহজে মেটানো যোগ্য। শ্রম বিভাগ জটিল নয়। যতটুকু শ্রম বিভাগ লক্ষ্য করা যায় তা অংশত নারী-পুরুষের প্রকৃতিজাত এবং অংশত অতি-প্রাকৃত বিশ্বাস-ভয়জাত। ব্যবসা-বাণিজ্যের দীর্ঘ ঐতিহ্য অনুপস্থিত। দ্রব্য বিনিময়, বিপদে-আপদে পারস্পরিক সাহায্য, আতিথেয়তাবশত-আদান-প্রদান, উৎসবে ব্যসনে দান-দক্ষিণা, প্রীতিভোজ, অপরাধে দণ্ড প্রভৃতি উপায়ে নিজ সমাজের মধ্যে সম্পদের বিলি-বন্টন হতো, কারো ঘাটতি পূরণ, কারো উদ্বৃত্ত দ্রব্য ভোগ করা হতো।

আলোচনার সুবিধার্থে উচইদের আর্থিক বৃত্তি সমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-খাদ্য আহরণ, খাদ্য উৎপাদন, পশু পালন, বংশপাত্র বুনন, বস্ত্র বয়ন ইত্যাদি। এসব

বৃত্তিগুলো এদের ক্ষেত্রে একে অপরের পরিপূরক। বৃহদাকার বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে করা হয় না। অন্যান্য আর্থিক ব্যবস্থার মতো উচইদের আর্থিক ব্যবস্থাও স্থিতিশীল নয়; গতিশীল, পরিবর্তনশীল। তারা সমতলবাসীদের অনুকরণে লাঙ্গলে-গরুতে চাষ, ফলের বাগান, চাকুরি, লেখাপড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঠিকাদারি, তেজারতি প্রভৃতি কাজে হাত বাড়াচ্ছে। নীচে তাদের প্রাচীন ও পরিবর্তিত আর্থিক বৃত্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হল।

১. খাদ্য আহরণ

খাদ্য আহরণী বৃত্তি বলতে এক্ষেত্রে বুঝানো হচ্ছে বনের শাকসবজি, ফলমূল সংগ্রহ, মাছ ধরা ও শিকার। খাদ্য আহরণের সুযোগ-সুবিধা দিন-দিন কমছে, খাদ্য উৎপাদনী বৃত্তির উপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে। এককভাবে খাদ্য আহরণের উপর বা খাদ্য উৎপাদনের উপর কেউ নির্ভর করে না।

সবজি আহরণ ঃ বঙ্গোপসাগরের উত্তর তীরবর্তী, মৌসুমী জলবায়ু বিধৌত ত্রিপুরার বনে প্রচুর শাকসবজি, ফলমূল আপনা থেকে হয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে আকাল হয়েছে বৈকি। খাবার ও ঔষধি হিসেব এসব ব্যবহার যোগ্য। অশ্বগন্ধা, আপাঙ, আকন্দ, আম, আমলকী, এরণ্ড, কচু, কলা, কন্টকারী, কাঁঠাল, কালকাসুন্দা, কুড়চী, গন্ধভাদুলে, গোয়ালে লতা, চালতা, চিরতা, জাম, ঢেঁকীর শাক, তেলাকুচা, তুলসী, থানকুনী, দুর্বা, ধুতুরা, নিম, নিসিন্দা, পাথরকুচি, বন আলু, বহেড়া, বাসব, বেত, বেল, বাঁশ-কড়ুল, মনসাপাতা, মেটে আলু, যজ্ঞ ডোঙর, হাড়ভাঙ্গা, খেতপাপড়া প্রভৃতি নানা জাতের ও নামের সবজি ও ফলমূল পাওয়া যায়।

উচইরা যেসব শাক-সব্জী সচরাচর সংগ্রহ করে উচই উপভাষায় এদের নাম হল—খুইয়া, খা খু, খা সে, কোংগা, সুই, খুনদই, সুসও, কামাত্রি, হানতারি খিত, সুই, খাপে, তারাই, খাইপ্ল, আমলাই, খুই চাং, আ কাও, দোয়া, জাঁ, দুক্রাউমা, খাইবাই, পাহেলা, চাম্ব, খাইচে, জকসই, পাস্যকুচ, খামপই, খামপই সুখু, বলাই, বুকলী ইত্যাদি।

বনের সবজি সবচাইতে বেশি মিলে বর্ষাকালে, আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে। সারা বছর একটু আধটু পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ষাকালেই প্রাচুর্য। বনআলু শরৎ কালেই বেশি সংগৃহীত হয়। মধু শীতকালে। এসব কাজ নারী পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ যে-কেউ করতে পারে। তবে সাধারণত মহিলারাই বেশি করে। পূর্বাহ্নে এককভাবে বা ছোট ছোট দলবেঁধে, খেয়ে-দেয়ে রওনা হয়। হাতে তাক্কল, পিঠে ঝুড়ি নিয়ে মা বোনেরা বেড়িয়ে পড়ে সবজি আহরণে, বাড়ি ফিরে দুপুরে। দুপুরের স্নান খাওয়ার পর এ-কাজে সাধারণত কেউ বের হয় না।

মাছধরা ঃ ত্রিপুরার বনে যেমন প্রচুর শাক সবজি পাওয়া যেত, তেমনি এখানকার নদী, নালায়, খালে-বিলে, সরোবরে বহু ছোট-বড় মাছ পাওয়া যেত। কৃষিক্ষেত্রে পোকা-মাকড় কীটনাশক ঔষধের ব্যবহারে, খালবিল আবাদের ফলে মাছ আগের মত পাওয়া যায় না। অবশ্য অপরদিকে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে মাছ-চাষের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে। অসংখ্য ছোট-বড় পুকুর, চৌবাচ্চা খনন করা হচ্ছে। বড়-বড় দীঘিতে, সরোবরে মাছের চাষ চলছে। গোমতী নদী প্রকল্পের ফলে হাজার হাজার কুইন্টাল মাছ পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও, ভারতের অন্যান্য প্রান্ত থেকে মাছ, ডিম, আমদানি করা হয়।

উচইরা মৎসাহারী। নারী পুরুষ যে-কেউ মাছ ধরতে পারে। তারা যে-সব মাছ সাধারণত ধরে তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল-পুটি, শিং, মাগুর, টেংরা, উগল, গুতুম, গেঁড়ী, বাইলা, বজরী, দারিকা, খইয়া, কই, গরই, ফলই, কুচিয়া, কাছিম, চাপিলা, আইড়, বোয়াল, গজার, ঘনিয়া, চান্দা, ঝিনুক, বাইম, মেনী, রুই, কাতল, শামুক ইত্যাদি।

মাছ ধরার জন্য যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, তাদের সাথে তিপ্রা, রিয়াং, নোয়াতিয়া ও বাঙালি সমাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সাদৃশ্য আছে। জাংগই, জাল, ডুলা, পলো, চাই, বারাই, সিঞ্চনী, ডুব, টেগইয়া, জুরখা, বর্ষি প্রভৃতি উভয় সমাজে ব্যবহৃত হয়। পার্থক্য নামকরণে, দ্রব্যে নয়। যেমন, পলোকে তারা বলে পলং, জাগইকে স্লাস, ভুরখাকে চকা, বারাইকে বরই। সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের কালে, মনে হয়, তারা বাঙালি সমাজের কতিপয় যন্ত্রপাতি নিজেদের ব্যবহারে এনেছে। জালের ব্যবহার এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তারা মাছ ধরে এককভাবে বা যৌথভাবে। হাতে, যন্ত্রে, জালে, বিষ প্রয়োগে, জল সিছে, বড়শি দিয়ে মাছ ধরা হয়। রু নামে এক প্রকার বন্য বিষলতার ছাল থেতলে জলে ফেললে বিষক্রিয়ায় মাছ অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে পড়ে। এ-প্রক্রিয়ায় নদী-নালার সরোবরের মাছ ধরা সহজসাধ্য। একক প্রচেষ্টায় ধৃত মাছ সাধারণত ঐ ব্যক্তির পরিবারই ভোগ করে। সমবেত প্রচেষ্টায় ধৃত মাছ সকলে মিলে-মিশে বন্টন করে নেয়। গাঁও-প্রধান কাজে অংশ গ্রহণ না করেও এক ভাগ পায়।

শিকার ঃ- ত্রিপুরার জঙ্গল শুধু শাক-সবজিতে সমৃদ্ধ নয়, পশু-পাখিতেও। বাঘ, ভালুক, হাতি, গণ্ডার, শূকর, হরিণ, শৃগাল, সজারু, বানর, রাম কুত্তা প্রভৃতি এখানে প্রসিদ্ধ। এসব পশুর অত্যাচারে কত মানুষ, খেতের ফসল, গৃহপালিত প্রাণী নষ্ট হত তার সীমা সংখ্যা নেই। ইতিহাসের পরিহাস এমনই যে, হাতির লোভে মধ্যযুগে নবাব বাদশাহরা বার-বার ত্রিপুরা আক্রমণ করেছে, পুতুল-রাজা হিসেবে কতজনকে গদিতে বসাল। বন জঙ্গল আবাদ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বন্য পশুর দৌরাত্ম্য অনেক কমেছে। গৃহপালিত পশু পাখির সংখ্যা বাড়ছে। খাদ্য আহরণী বৃত্তি হিসেবে শিকারের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। খাবার হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যে-সব পশু পাখি উচইরা শিকার করে তন্মধ্যে উল্লেখ্য হল শূকর, হরিণ, শজারু, ঘুঘু, পান কৌড়ি, বালি হাঁস, বন মোরগ ও মহিষ। টিয়া, ময়না, কোকিল, প্রভৃতি ভেট হিসেবে দিতে, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বা পালার জন্য ধরা হয়।

শিকার এককভাবে বা দলবেঁধে করা হয়। খুব বড় শূকর বা হরিণ ধরা পড়লে পাড়ার সকলে অংশ পায় বিনা পয়সায়। পাড়ার চৌধুরী পেছনের পা পায়। এমনকি, শিকারি কুকুর এবং বন্দুকের মালিক বাড়তি ভাগ পায়। শিকার পুরুষের কাজ। মহিলারা এ কাজ করে না, করলে বজ্রাঘাতে অপমৃত্যু হবে বলে লোক বিশ্বাস।

শিকারে বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি ও ফাঁদ ব্যবহার করা হয়, যথা—তাক্কল, রামদা, বল্লম, লাঠি, শেল, গুলতি, তীর ধনুক, খেদা, আঠা, আগুন, গর্ত, ফাঁদ, বন্দুক ইত্যাদি। শিকারি কুকুর, ঘুঘু, মোরগ, হাতি প্রভৃতি ব্যবহারের চলন আছে। উচইদের উপভাষায় কয়েকটি যন্ত্রপাতির

ও ফাঁদের নাম এরূপঃ- জে, বাতা, খই, সি, তক-খুগ, পাফুং, মংখুং, বুরা। এর মধ্যে বিশেষ দু-একটির বর্ণনা দেয়া যেতে পারে। বাতা শব্দের বাংলা অর্থ দাঁড়ায় শেল। যে-পথ দিয়ে হাতি, শূকর প্রভৃতি যাতায়াত করে সে-পথে ইহা বসানো হয়। প্রায় ১৫ ফিট লম্বা একটি বাঁশকে কেটে ভূমি থেকে ২ ফিট পরিমাণ উপরে পথের পাশে সমান্তরালভাবে বাঁধা হয়। বাঁশটির অগ্রভাগে একটি ধারালো, চোখা শেল বাঁধতে হয়। বাঁশের পশ্চাৎভাগ শক্ত করে বেঁধে অগ্রভাগকে টেনে নিতে হয় পেছনের দিকে। শেলের মুখ থাকে পথের দিকে। বাঁশটির অগ্রভাগে যেখানে শেল বাঁধা হয়েছে সে-বিন্দু থেকে একটি সরু কিন্তু শক্ত দড়ি রাস্তার উপর দিয়ে ওপারে টানাটানি করে বাঁধতে হয়। পশু পথ দিয়ে যাওয়ার সময় দড়িতে পা আটকালে অমনি শেলের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়ে দ্রুত বেগে পশুর পেটে বিঁধবে। উচইদের প্রতিবেশীদের মধ্যেও ইহার প্রচলন ছিল। তিপ্রারা বলে দুক, রিয়াংরা বলে ইয়েফুং।। খই একটু ভিন্ন প্রকৃতির ফাঁদ। বনের মধ্যে একটি বাঁশ বা গাছের ডালের অগ্রভাগে দড়ি বেঁধে নুইয়ে ফেলতে হয়। নীচে মাটিতে একটি ঘুটিতে হরকি-গিট দিয়ে বাঁধতে হয়। গিট দেয়ার পরও দড়ির অবশিষ্ট অংশ থাকতে হবে। সেই অংশ দিয়ে একটি ফাঁসির গিট সদৃশ একটি গিট একটি বাঁশের ছোট চতুষ্কোণ মাচায় রাখতে হয়। মাচার উপর তথা গিটের মধ্যে খাবার ফেলতে হবে। খাবারের লোভে পাখিরা এসে জটলা করবে, ঝগড়া করবে। তন্মধ্যে যে-কোন এক-দুইটি পাখির পায়ে জড়ালে দড়িতে টান পড়বে। অমনি হরকি-গিট খুলে নিমেষে টেনেরাখা বাঁশ বা গাছের ডালটি খাড়া হয়ে যাবে। ধরাপড়া পাখি ঝুলতে থাকবে।

শিকারে সফলতা লাভের উদ্দেশ্য বনদেবতার পূজা দেওয়ার রেওয়াজ আছে। সাধারণত বড় প্রাণী পাওয়ার আশায় এসব পূজা দেয়া হতো। তিপ্রা ও রিয়াংরাও পূজা দিত। ধৃত পশু বাড়িতে আনার পর এক মুঠো চাল তার গায়ে ছিটে দিতে হয়, যাতে পশুটির সবংশ পরে ধরা পড়ে। তিপ্রা সমাজে প্রথাটি একটু ভিন্ন ধরনের। শিকারির স্ত্রী রান্নায় ব্যবহৃত হাতা বা চামচা দিয়ে পশুটিকে স্পর্শ করে। অতঃপর গ্রামের ওঝা এক টুকরো মাংস কেটে মন্ত্র পড়ে বনদেবতাকে প্রথমে নিবেদন করে সম্ভাব্য দোষ বা কুদৃষ্টি দূর করে দেয়।

২. খাদ্য উৎপাদন

উচইরা শুধুমাত্র খাদ্য-আহরণী বৃত্তি-নির্ভর নয়। খাদ্য তারা উৎপাদনও করে। বরং খাদ্য উৎপাদনের আকার, প্রকার, পদ্ধতি দিন-দিন বাড়ছে ও জটিল হচ্ছে। খাদ্য উৎপাদন মোটামুটি ত্রিবিধ উপায়ে করছে-উঁচু টিলায় আদিম স্থানান্তরী চরণ চাষ বা জুম চাষ, লাঙলে-গোরুতে নিম্ন সমতল ভূমিতে স্থায়ী চাষ এবং বাগান। উৎপাদনের পদ্ধতিতেও পরিবর্তন লক্ষণীয়। জুম চাষের খাতিরে একা একটি পাড়া, এক জায়গায়, দীর্ঘকাল থাকত না। পাঁচ, সাত, কি, দশ বছর পর-পর স্থান পরিবর্তন করত। অধিক জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে নতুন পাড়া স্থাপন করে জুম চাষ করত। এক্ষণে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যত্রতত্র, যখন-তখন পাড়া পাল্টানো অসম্ভব। তাই জুম চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। স্থায়ী চাষ ও ফলের বাগানের প্রতি ঝোঁক বাড়ছে।

জুম চাষ ঃ উচইরা জুম চাষকে বলে হু। রিয়াংরাও হু বলে। তিপ্রারা বলে হুক। বাঁশ, গাছ,

লতা, গুল্ম, ঝোঁপ, ঝাড়ে ভরতি পাহাড়ের ঢালু স্থান জুম চাষের আদর্শ ক্ষেত্র। নারী, পুরুষ যুবক-যুবতী মিলে-মিশে একাজ করে। বিশেষত পাড়ার যুবক-যুবতীদের দল পালাক্রমে বিভিন্ন পরিবারের খেতের কাজ করে দেয়। এজন্য মজুরি দিতে হয় না। এমনকি, যে-যার বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে যায়। এ প্রথাকে বলে জাগু রুলাইসি। জুম চাষ হঠাৎ একদিনের কাজ নয়। ধাপে-ধাপে সারতে হয়। স্থান নির্বাচন, বন কাটা, পোড়ানো, আধপোড়া গাছ-পালা পরিষ্কার, বীজ বপন, নিড়ানী, পাহারা ও ফসল কাটা। এসব কাজের সহিত কিছু লোকাচার জড়িত আছে।

জুমের কাজ শুরু হয় শীতকালে। পৌষ-মাঘ মাসে (অর্থাৎ নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে)। কোন এক শুভ দিনে পূর্বাহ্নে গৃহস্বামী, ওঝা সহ, মনোনীত টিলায় যায়। খানিকটা বন কেটে ভবিষ্যৎ পরীক্ষা করার নিয়ম। এক টুকরা বাঁশকে দোফালা করে, বুকের সমান উঁচু থেকে পরিষ্কৃত স্থানে ফেলা হয়। যদি এক ফালা চিৎ, অন্য ফালা উপুড় হয়ে পড়ে তবে শুভ। প্রথমবারেই ইঙ্গিত ভাবে পড়লে উত্তম। না পড়লে তিনবার চাওয়া হয়। তাতেও যদি শুভভাবে না পড়ে তবে বিকল্প স্থান দেখতে হয়। ঐ সময় যদি হরিণ বা চিল ডাকে তবে অমঙ্গল। মোরগের ডাক মঙ্গল কারক। এরপর ঐস্থান থেকে এক চাকা মাটি বাড়িতে এনে, রাত্রে গৃহস্বামী একাকী, ধোয়া-পরিষ্কার করা বা নতুন কাপড় পরে, মাটির চাকাটি বালিশের নীচে রেখে শুয়ে পড়ে। চাষী আশা করে স্বপ্নে ঐ স্থানের শুভাশুভ জানতে পারবে বলে। স্বপ্নে জল, মাছ, বিবাহানুষ্ঠান দেখা শুভ। হাতি, বাঘ, আগুন, টাকা, লেংটা লোক দেখা অশুভ। স্বপ্নাদিস্ট হবার প্রথা তিপ্রা, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, নাগা সমাজের মধ্যেও বিদ্যমান।

খালিপেটে, বিকেলে জুম কাটার কাজ শুরু করা হয় না। খেয়ে দেয়ে উষাকালে বন কাটার কাজ যাত্রা করতে হয়। বন কাটার একমাত্র যন্ত্র দা বা তাক্কল। ভোরে তাক্কলে ধার দিতে হয়। তখন তাক্কলটি ভাঙ্গলে বা ধার দেবার পাটাতনটি ভাঙ্গলে অমঙ্গল। সূর্যদেব ও পৃথিবীকে প্রণাম করে, দেবতাদের দোহাই দিয়ে প্রথম কোপটি দেয়। বন কাটতে-কাটতে যদি গভীর গর্ত বা কোন মরা কালো বানরের পঁচা-গলা দেহ পাওয়া যায় তাহলেও অশুভ। এসব ক্ষেত্রে মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে প্রতিকার করে নেয়।

পৌষ-মাঘ মাসে বন কেটে ঐখানেই শুকাতে দেয়। চৈত্র মাসে পোড়া দেয়। শুকনো বনে আগুন ধরিয়ে দিলেই হল না। বাড়ির অপবিত্র আগুনে পোড়ানো নিষেধ। বাঁশে-বাঁশে ঘসে উৎপন্ন পবিত্র আগুনে জুম পুড়তে হয়। ভূত প্রেতের অত্যাচার রোধ করতে সরিষা ছিটিয়ে দেয় জুম পোড়ানোর সময়। বাড়ির উঠানে গৃহবধূ কালো পাতিল, ঝাড়ু, তেল, ঘিলা, তুলা, পাখা, এক ঘটি জল এক জায়গায় সাজিয়ে রাখে। তাৎপর্য হল এই যে কালো পাতিল ভূতপ্রেত নিবারক; ঝাড়ু মুখ-দোষ নিবারক; তেল দেবতার প্রিয়; ঘিলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতীক; বন পুড়ে ছাই যেন তুলার মত সাদা হয়ে যায়; বসুমাতার বুক পোড়া যায় জুম পোড়ানোর সময়, তাই পাখার বাতাস চাই, তৃষ্ণার্তা বসুমাতার জন্য এক ঘটি জল। এটি চেতনার প্রতীক।

বীজ বপনের সময়ও কতিপয় আচার পালনীয়। সোনা-রূপার জল ছিটাতে হয় জুম খেতে।

এক টুকরো হলুদকে সাত টুকরো করে কেটে ফেলতে হয় এবং সূর্যদেবকে প্রণাম করে, এক ঘটি তীর্থ-বারি ঢেলে ঈশান কোণে বপনের কাজ যাত্রা করে পূর্বাহ্নে। যাত্রাস্থানে সবরকম বীজ লাগানোর নিয়ম। একটি মোরগের বাচ্চা বলি দিয়ে দেবতার বর মাগে গৃহস্থ। ফসল কাটার সময় হলেও উক্ত স্থানের ফসল কাটা নিষেধ। ঐ ফসল দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। ইহা বালাসু নামে পরিচিত।

জুমের খেতে একাধিক জাতের বীজ বপন ও ছিটানো হয়। ধান, তুলা, চিন্দ্রা, মার্মা, ঝিংঙা, কাওন, কুমড়ো প্রভৃতির বীজ বপন করা হয়। তিল, লংকা, ধন্যা, বেগুন প্রভৃতির বীজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। আদা, হলুদ ইত্যাদি লাগানো হয়। সাত-আট ইঞ্চি অন্তর-অন্তর ছোটো-ছোটো গর্ত করে বীজ বপন করে মাটি চাপা দেয়। জুমে বহুল ব্যবহৃত বীজের তথা ফসলের নাম দেয়া গেল—ধান (মাই), পাট (নানিয়া), তুলা (খু), শস্য (মথাই), বেগুন (ফান্ত), ঢেড়স (মুর্মি), শিম (গচই), বরবটি (সুবাই), ভুট্টা (মাকুন্দ), কুমড়ো (চাকমা), চুনা-কুমড়ো (খাকলু), হলুদ (সুতই), তামাক (উমা), কাওন (মাইসই), লাউ (সুইলাও), কচু (থা), পঞ্চমুখী (থাপে), ফুল (বৈকুং) ইত্যাদি। জুমে প্রায় পঁচিশ পদের বীজ বপন করতে দেখা যায়। নব বিবাহিত দম্পতির হাত খরচ মেটানোর জন্য এক বাস্তবানুগ ব্যবস্থা আছে। পারিবারিক জুম খেতের এক কোণে কতটুকু বাড়তি খেত করতে অনুমতি পায় নব দম্পতি। বীজ পরিবারের যৌথ ভাণ্ডার থেকে আসে। এর পরিচর্যা করে নব দম্পতি। এর নাম খুল রিসি। বিক্রয় করে টাকা নেয় দম্পত্তি।

চৈত্রের মধ্যেই বপনের কাজ সেরে ফেলতে অনেকের লক্ষ্য থাকে। ৭ই বৈশাখ গড়িয়া পূজা। চেষ্টা থাকে গড়িয়া পূজার আগে রোপণের কাজ সমাপন করার। বৈশাখের শেষ ভাগে জুম ক্ষেতের মধ্যে সুবিধাজনক উঁচু স্থানে পাহারা দেয়ার উদ্দেশ্যে মাচা-ঘর বানায়। ইহার নাম কাইরেং। তিপ্রারা বলে গাইরেং। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথমার্ধের মধ্যে পাহারার ব্যবস্থা জোরদার করতে হয়। এজন্য সারা খেতে কিছুদূর পরপর বাঁশের খুঁটি পুতে এবং সবক'টি খুঁটিকে উদাল গাছের ছাল দিয়ে তৈরি দড়ি দিয়ে সংযুক্ত করে। দীর্ঘ দড়িটির একদিক কাইরেং নামক পাহারা ঘরের পালার সাথে আবদ্ধ। খেতের বাঁশের খুঁটিগুলোর অগ্রভাগ ফাটিয়ে নেয়। পাহারাদার প্রয়োজনে দড়ি ধরে টান দিলেই অমনি একযোগে সবক'টি বাঁশ কেঁপে শব্দ করে। পশু-পাখি ভয়ে পালায়। খেতে পোকা মাকড়ের উপদ্রব অস্বাভাবিক হলে ওঝা এনে মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যবস্থা করে গৃহস্থ। জুম ক্ষেতে আগাছা, ঘাস নিড়াতে হয় চারবার। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে নিড়ানীর কাজ সারতে হয়। চারবার নিড়ানীর নাম ভিন্ন-ভিন্ন যথা-হাগরা, মাইস্কাং, মাইজাগু এবং খুল ঘাসে।

সব ফসল একসাথে আসে না। শশা, চিন্দ্র, মার্মা প্রভৃতি আষাঢ়ের প্রথম ভাগে আসে। কিন্তু দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন না করে তারা নিজেরা প্রথমে কিছু খায় না। শশা প্রভৃতি প্রথমে অনাড়ম্বরে নিবেদন করে। পরে আশ্বিনে ধান এলে নবান্ন উৎসব সাড়ম্বরে পালন করে।

জুমের মুখ্য ফসল ধান। ফসল কাটার সময় শুধু ধানের পাকা ছড়া বা শিস কাটা হয়। কাস্তে দিয়ে কেটে পিঠে ঝুলানো ঝুড়িতে রাখে কৃষক। শিস সমেত ধান গোলা ঘরে সংরক্ষিত অবস্থায়

থাকে। সাবেকি সংরক্ষণ ব্যবস্থা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। পাড়াতে যে-কয় ঘর গৃহস্থ থাকে সকলে মিলে-মিশে পাড়া থেকে সামান্য দূরে পথের পাশে সারিবদ্ধ ভাবে ছোট-ছোট গোলাঘর তৈরি করে। তাতে স-শিস ধান সংরক্ষিত হয়। আগুনের হাত থেকে রক্ষার জন্য একটু দূরে গোলাঘর বানায়। চোরের উপদ্রব প্রাচীন কালে তেমন ছিল না। এই ব্যবস্থার এখন অবলুপ্তি ঘটেছে। গোলাঘরের সামনে একটি ছোট মোরগ বলি দেয় নবান্ন উৎসবের দিন।

৩. পশু পালন

অতীতে পশু পাখি পালন মুখ্য উপজীবিকা ছিল না। পারিপার্শ্বিক অন্তরায় ছিল প্রবল। শ্বাপদ সংকুল বন্য পরিবেশে গোরু, ছাগল, হাঁস, ভেড়া পালন বিপজ্জনক। তাই মাত্র তিন ধরণের প্রাণী পোষত ঃ- শূকর, মোরগ ও কুকুর। কুকুরের কাজ প্রতিরক্ষায় ও শিকারে। শূকর ও মোরগ খাবার ও বলি হিসেবে ব্যবহৃত হত। গৃহস্থের আর্থিক অবস্থার অন্যতম সূচক ছিল শূকরের সংখ্যা। যার যত বেশি শূকর, তার তত বেশি সুনাম। কোন অপরাধে দণ্ড বিধানের অন্যতম উপায় শূকর। বিবাহে, উৎসবে, ব্যসনে শূকরের মাংস না হলে চলে না। রোগে, শোকে, জন্ম-মৃত্যুতে, চাষে অজস্র বলির বিধান দিত ওঝা। সেক্ষেত্রেও মস্ত বড় শূকর বলি দেয়া যায় না। তখন শূকর শাবক বা মোরগ বলি হয়।

বন্য পরিবেশে বাঘ ভালুকের সাথে লড়াই করে টিকতে পারে মহিষ। মহিষ পালন শূকর, মোরগ, কুকুরের পর শুরু হয়। গত ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ উপজাতি সমাজে লাঙলে কৃষিকাজ শুরু হলে ঐ মহিষই প্রথম কাজে আসে। কিন্তু মহিষ বড় বেসামাল, অবাধ্য জীব। এদিকে বন জঙ্গলও পরিষ্কার হতে লাগল। অতঃপর বলদের আগমন। এখন উচইদের মধ্যে গোরু, ছাগল, হাঁস, কবুতর, বিড়াল পালন ঘরে-ঘরে। পূর্বের শূকর, মোরগ ও কুকুর তো আছেই।

গোবাছুরাদির অসুখ হওয়া কিংবা বনে হারিয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এমন ঘটনা ঘটলে লোক বিশ্বাস বুড়াছা ও হাইচুমা নামক খল দেবতা দম্পতির কারসাজি। এই দেবতা-যুগল বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী। তারা ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রুষ্ট। তাদের পূজা দিলে গৃহপালিত পশু পাখির রোগ সারে, হারানো প্রাণী ফিরে পাওয়া যায়।

৪. কুটির শিল্প

উচইদের মধ্যে কুটির শিল্পের বিশেষ প্রসার ঘটেনি। বাংলা ভাষাভাষি সমাজে কুরি, ক্ষৌরিক, কর্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর, স্বর্ণকার, চর্মকার, জেলে, বণিক, তেলী প্রভৃতি পেশা ও বৃত্তিভিত্তিক শ্রমবিভাগ ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে; উচই, তিপ্রা, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, কুকি, হালাম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে তা হয়নি। কিন্তু বস্ত্র বয়নে ও বংশপাত্র বুননে এদের পারদর্শিতা প্রশংসনীয়।

বংশপাত্র বুনন ঃ ত্রিপুরার বনে বিভিন্ন জাতের বাঁশ ও বেত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

এখানকার উপজাতিদের জীবনের সহিত বাঁশ বেত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গোটা পূর্বভারতের উপজাতীয় সংস্কৃতিতে বাঁশের প্রভাব ও গুরুত্ব সাংঘাতিক। উচই ও তাদের সগোত্রীয় প্রতিবেশীদের মধ্যে ঝুড়ি বুনন পুরুষের কাজ। লোকবিশ্বাস মহিলারা বাঁশ বেতের কাজকর্ম করলে ভালুকে কামড়াবে। এমনকি, মহিলাদের দা-তাক্কল ধারানো নিষেধ। ধারালে দিন দীর্ঘায়িত বা লম্বা হয়ে যায়। মহিলাদের উপর নিষেধ আছে অন্যের ঘরে গিয়ে বেত চাওয়া বা যাঞা করা। যদি অসাবধানতাবশত ভুলক্রমে চায়, তবে গৃহস্থ যে-করে হোক যোগাড় করে দেয়। না দিলে ক্ষতি হবে। অপরপক্ষে, ঝুড়ি বুননে কুশলতা পুরুষের গৌরব বৃদ্ধি করে। এ-কাজে দক্ষতা, যুবকের পক্ষে, বিবাহের ক্ষেত্রে যোগ্যতা বিশেষ। বিয়ের আগে প্রত্যেক যুবককে দোলনা নির্মাণ কৌশল শিখতেই হবে। যদি কোন কারণে না পারে, তবে বিয়ের অব্যবহিত পরই অযুগ্ম মাসে দোলনা বানাতে হবে। অন্যথায় শিশুর অকল্যাণ হবে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে বলে লোক বিশ্বাস। নবনির্মিত দোলনায় সর্বাগ্রে একটি শিলা এবং এক টুকরো কাপড় রাখে যাতে শিশু দীর্ঘায়ু ও নিরোগ হয়।

উচই, তিপ্রা, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, কুকি ও হালামরা বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন আকারের, আকৃতির, নামের বংশপাত্র তথা ঝুড়ি ডালা, কুলো, ডোল, ওরা, ধারি, দর্মা, পাখা, চিরুনি নির্মাণ করে। তাদের তৈরি গোলাকৃতি ডালা সৌন্দর্য ও স্থায়িত্বের বিচারে সারা ভারতে শিল্প প্রতিযোগিতায় প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। এদের তৈরি কয়েকটি বংশপাত্রের নাম এরূপ—তুইলাংগা, নওখাই, দিংরা, চেমপাই, খ্রে, বাইলেং, বাইলেং খু, ফুইখা, লাখু, ওয়াইয়েং, চাংলি, কাইস্লি, মাইচা, চাখাইকক, মাইতু, সাংয়িকনামা ইত্যাদি।

বস্ত্র বয়ন ঃ- ত্রিপুরার পাহাড়ে শিমুল তুলা গাছ অসংখ্য। এছাড়া কার্পাস তুলার চাষ করে আদিবাসীরা তাদের জুমে। জুমের ভূমি সংকোচিত হয়ে আসছে দিন-দিন। অদূর ভবিষ্যতে জুম চাষের অবলুপ্তি ঘটবে। শুধু ইতিহাসের পাতায় জুম চাষ টিকে থাকবে। এদিকে রং বেরং এর কলে তৈরি কাপড়ের হাতছানি, রুচিবোধে পরিবর্তন। পেশায়-নেশায় পরিবর্তন বস্ত্র বয়ন শিল্পের সংকটের পূর্বাভাস দিচ্ছে। সরকারি অনুদানে সুতা-প্রাপ্তি রোগীকে নুন জল সেবন করানোর মত কাজ করছে।

উচই, তিপ্রা, রিয়াং, জমাতিয়া, হালাম, কুকি প্রভৃতি সমাজে বস্ত্র বয়ন মহিলার কাজ। পুরুষের একাজ করা নিষেধ। নিষেধ না মানলে শিকারে পুরুষ ব্যর্থ হবে। কোন পুরুষ অন্যের ঘরে গিয়ে সুতো যাঞ্চা করবে না, করলে তার কোন পুত্র কন্যার অমঙ্গল, এমনকি মৃত্যু হতে পারে।

বস্ত্র বয়নের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বন ও জুম খেত থেকে সংগৃহীত হয়। তাঁত তৈরির বাঁশ ও গাছ আনা হয় বন থেকে। তুলা জুম খেতের। রং এর জন্য লতাগুল্ম, বাকল ইত্যাদি বনজ। জুম চাষের প্রায় সর্বশেষ ফসল হল কার্পাস তুলা। সংগ্রহের সময় শীতকাল, কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ (অক্টোবর-নভেম্বর) মাস। সংগ্রহ, খোসা ছাড়ানো, শুকানো, বীচি ছাড়ানো, পাকানো, রং করানো, বয়ন প্রভৃতি একের পর এক সমস্ত প্রক্রিয়া মহিলারা করে। গামছা,

জামা, উত্তরীয়, আলোয়ান, বক্ষাবরণী, শাড়ি, বালিশ, চাদর ইত্যাদি বয়ন করে। এদের ভাষায় কাপড়ের নাম একাধিক, যেমন রিকাংসা, রিকাংস, কুতাই, রুনাই, রিসা, বকি, রিতবাক।

৫. ওজন ও মাপজোখ

ভারতের পূর্বাঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের ঐতিহ্য সবে মাত্র গড়ে উঠেছে। অতীতে এ ব্যাপারে নিষ্প্রয়োজনীয়তা ও উদাসীনতাবশত এদিকটা অনুন্নত রয়ে গেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে কম। মানেরও মাপের সমানীকরণ ও সাধারণীকরণ হয়নি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্নতা বিদ্যমান। উচইদের মধ্যে এ বিষয়ে যে-সব প্রথা চালু আছে, তার সাথে তাদের নিকটতম প্রতিবেশী রিয়াং, তিপ্রা, নোয়াতিয়া, জমাতিয়ার প্রথার সহিত কিছুটা সাদৃশ্য আছে। রাজ-আমলে সমতলবাসী সমাজের মাপ প্রথা তাদের মধ্যে চালু হয়। অধুনা সর্বভারতীয়, এমনকি আন্তর্জাতিক, মাপ প্রবর্তিত হয়েছে প্রশাসনিক প্রচেষ্টায়। নীচে সাবেকি প্রথার বর্ণনা করা হল।

সংখ্যা ঃ ১ = হা, ২ = নই, ৩ = খাঁ, ৪ = ব্রই,
৫ = বা, ৬ = দুউ, ৭ = স্নি, ৮ = চা,
৯ = স্কু, ১০ = চি, ১১ = চিহা, ১২ = চিনই,
১৩ = চিখাঁ, ১৪ = চিব্রুই, ইত্যাদি।

সময় ঃ ব্রাহ্ম মুহূর্ত = আইচু করা, উষালগ্ন = আইপ্রঁদাই,
ভোর = আঁইছা, পূর্বাহ্ন = ফস আইদ্র,
মধ্যাহ্ন = দিব, হালন্তি = সাইসবলা,
বিকেল = সারই, সন্ধ্যা = সানজা,
রাত = চেরাই থুকব, মধ্যরাত = হাজরা,
রবিবার = তালাংগ্নি, সোমবার = তালাংগ্না,
মঙ্গলবার = আংগা বুধবার = ম্দু,
বৃহস্পতিবার = ক্রাও সামদি, শুক্রবার = সৌক্রা,
শনিবার = চানি।

সূর্যগ্রহণ = সা রংজামি, চন্দ্রগ্রহণ = তা রংজামি।
কৃষ্ণপক্ষ = তাথুইসঁ, শুক্লপক্ষ = তাকতা।

বৈশাখ মাস = চৈতি, জ্যৈষ্ঠ = আসাড়ে,
আষাঢ় = শ্রাও শ্রাবণ = ইন্দ্রি,

ভাদ্র = দুর্বই, আশ্বিন = অসা,
কার্তিক = কাথই, অগ্রহায়ণ = মাংস্রই,
পৌষ = মাংজু, মাঘ = ফাঁগ,
ফাল্গুন = চেংরা, চৈত্র = বৈসু।

গ্রীষ্মঋতু = সাতুংব্রা, বর্ষা = বাসা,
শরৎ ও হেমন্ত = সাজলাং, শীত ও বসন্ত = মাসিং।

দিক নির্ণয় ঃ- পূর্ব = সাকা, পশ্চিম = সা থাং, উর্দ্ধ = নউখা, অধ = হা।
উত্তর = উত্তর দক্ষিণ = দক্ষিণ

দৈর্ঘ্য পরিমাপ ঃ- শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে দৈর্ঘ্যের পরিমাপ করা হয়।

এক আঙ্গুল পরিমাণ দৈর্ঘ্য	=	জকসই সিহা।
দুই আঙ্গুল পরিমাণ দৈর্ঘ্য	=	জকসই সিনই।
চার আঙ্গুল পরিমাণ দৈর্ঘ্য	=	জিকসই সিন্দ্রই।
বুড়ো ও তর্জনী টানলে যে দৈর্ঘ্য	=	খুচেলা
বুড়ো ও মধ্যমা টানলে যে দৈর্ঘ্য	=	গাড়াহা
এক মুঠো হাত টানলে যে দৈর্ঘ্য	=	মুংচ
এক হাত টানলে যে দৈর্ঘ্য	=	মুহা
পুরো হাত টানলে যে দৈর্ঘ্য	=	খাংরাই খুনউ
দু'হাত টানা টানলে যে দৈর্ঘ্য	=	মিয়াহা
পাঁচ হাত টানলে যে দৈর্ঘ্য	=	জাপা ধাওহা

উচ্চতা পরিমাপ ঃ-

পায়ের তলা থেকে হাঁটু	=	জাসকু
পায়ের তলা থেকে কোমর	=	চাংসি
পায়ের তলা থেকে বুক	=	খাবা
পায়ের তলা থেকে গলা	=	গরণা জরা
পায়ের তলা থেকে মাথা	=	মুসা কুসুম হা।

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক প্রকরণ

উচইদের সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সহযোগিতা, সৌহার্দ্য, সৌভ্রাতৃত্ব, সৌষ্ঠব, সম্প্রীতি সমতা, সরলতা, একাত্মতা, নির্ভরশীলতা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ছিল। মানব সমাজ চিরকাল পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন শুধুমাত্র বিংশ শতাব্দীরই একচেটিয়া বৈশিষ্ট্য নয়। বিশ্বজোড়া অধুনা পরিবর্তনের যে-ঢেউ এসেছে, তার তরঙ্গ প্রবাহ ত্রিপুরার প্রত্যন্তর পাহাড়-পর্বতেও লাগছে। এখন প্রাচীন সমাজ-জীবনের চেহারা পাল্টাচ্ছে। গ্রামের ঘন বসতি ভাঙছে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ শিথিল হচ্ছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধ বাড়ছে। বৈচিত্র্য আসছে পোশাকে, পেশায়, নেশায়, তাদের আচারে, অনুষ্ঠানে, ধর্মে, কর্মে, চলনে ও বলনে। নীচে উচইদের প্রাচীন সামাজিক জীবন-যাত্রার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রতিবেদিত হল।

১. আহার-বিহার

উচইদের প্রধান খাদ্য ভাত। ভাতের সাথে থাকে সামর্থ্য ও সুযোগ সুবিধানুসারে শাক সবজি,

মাছ বা মাংসের তরকারি। কর্মক্ষম প্রাপ্ত বয়স্করা দিনে তিন বেলা আহার করে। সুস্থ শরীরে পরিশ্রম করলে প্রতিবেলায় এক ব্যক্তি প্রায় আধ কেজি পরিমাণ চালের ভাত খেতে পারে। শিশু ও বুড়োরা ঘন-ঘন খায়, কিন্তু পরিমাণে কম। মাঠে বা জুম খেতে কাজের সময় কর্মীরা সকাল ও রাত্রের খাবার বাড়িতে খায়, দুপুরের খাবার মাঠে বসে খেয়ে নেয়।

উচইদিগকে প্রায় বহুভুক বলা যায়। তবে তারা কতিপয় প্রাণী খায় না, যেমন কুকুর, কাক, বক, চিল, বিড়াল, শকুন, শিয়াল, বাঘ, সিংহ, ইঁদুর, পেচা, গরু ইত্যাদি। তাদের খাদ্য তালিকায় পড়ে চাল, ডাল, ভুট্টা, গম, বিভিন্ন শাক-সব্জী, ফলমূল, হরেক রকমের মাছ, শামুক, গেঁড়ী, অজগর, মোরগ, সোনা ব্যাঙ, কবুতর, ঘুঘু, হাঁস, পাতিহাঁস, পানকৌড়ি, চড়াই, বুলবুলি, হরিণ, শূকর, হাতি, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি। গরু বা মহিষের দুধ তাদের নিকট দুর্গন্ধময় মনে হত। সম্প্রতি অবশ্য দুধ খেতে আরম্ভ করেছে। নানা প্রকার মশলা, মদ, পান, তামাক, বিড়ি, সিগারেট, চা প্রভৃতি তাদের প্রিয় খাদ্য। খই, চিড়া, মুড়ি প্রভৃতির প্রস্তুত প্রণালী আগে জানত না। এক্ষণে সমতলবাসীদের অনুকরণে সেসব তৈরি করে; বাজার থেকে কিনে খায়।

উচইদের খাদ্য প্রস্তুতি প্রণালীতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। সমতলবাসীদের সাথে সংস্পর্শের আগে মাটির বা ধাতব হাড়ি বাসনের ব্যবহার জানত না। কাঁচা বাঁশের চোঙায় জল ও চাল ভরে মুখ বন্ধ করে আগুনের ধারে রেখে দিত। আরেক চোঙায় জল, মশলা দিয়ে সবজি রাঁধত। পরিবারের লোক সংখ্যানুসারে চোঙার সংখ্যা ব্যবহৃত হত। উচই ও তাদের প্রতিবেশী সমাজে উনুনের নাম থাপা বা থাপতাই। থা মানে বন-আলু। মনে করা অযৌক্তিক হবে না যে এই উনুন প্রথমে বন আলু পুড়ে খাওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল। পরে তিনটি মাটির ঢেলাকে ত্রিভুজাকৃতি সাজিয়ে মৃৎ পাত্র বা ধাতব পাত্র বসানোর ব্যবস্থা হয়। তাদের ঘর বাঁশ বেত গাছ দিয়ে নির্মিত। এমনকি মেঝেটাও মাটি থেকে একটু উপরে বাঁশের মাচা। তাতে উনুন নির্মাণ অসুবিধাজনক। তাই ঘরের ভেতরেই, মেঝের এককোণে প্রায় দশ ইঞ্চি পুরু করে মাটির প্রলেপ দিয়ে তার উপর উনুন তৈরি করা হয়। এটি সূক্ষ্ম-বুদ্ধির পরিচয়।

রান্নার পদ্ধতি বিভিন্ন রকমের ঃ রোদে শুকিয়ে, আগুনে সেঁকে, ঝলসে, পুড়ে, সিদ্ধ করে, বাঁশের চোঙে থেঁতলে নানা স্বাদের খাবার তৈরি করে উচই মহিলা। মুখরোচক মশলার ব্যবহার আগের চাইতে এখন বাড়ছে। তিল-তিসি-সরিষার গাছ ও মুলিবাঁশ পোড়ানো কয়লা ত্রিকোণাকৃতি বাঁশের চোঙ (চাকিখক) এর ভেতর ভরে উপর থেকে জল ঢেলে দিয়ে খারপানি তৈরি করে। বনবাসী সমাজে লবণ আগমনের আগে এই খারপানিই লবণের কাজ করত।

উচইদের প্রধান নেশা মদ। এছাড়া, পান, তামাক, ভাং ও গাঁজা। উৎসবে, ব্যসনে, রাজদ্বারে, শ্মশানে, অতিথি-অভ্যাগত আপ্যায়নে, বিবাহ বাসরে, মদ না হলে অনুষ্ঠানের যেন অঙ্গহানি

ঘটে। ভাতকে পচিয়ে পাতন প্রক্রিয়ায় মদ প্রস্তুত করে বাড়ির মহিলারা। একাজে পুরুষের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ। পুরুষ হাত বাড়ালে মদ বিস্বাদ হয় বলে বিশ্বাস। এমনকি এক পরিবারের পুরুষ অন্য পরিবারে গিয়ে গাঁজনের মুলি চাইতে পারে না। যদি অসাবধানতাবশত চেয়ে ফেলে তবে ঐ গৃহস্থের উচিত যে করে হোক মুলি জোগাড় করে দেয়া, অন্যথায় অমঙ্গল। ভাতকে গাঁজিয়ে না নিলে মদ তৈরি করা যায় না। তাড়াতাড়ি গাঁজনের উদ্দেশ্যে চালের গুড়ো ও গাছ গাছড়ার পাতা, ছাল ও শিকড় দিয়ে মুলি করে। উচইদের ভাষায় এসব গাছ পালার নাম—চিচাংফা, লুংতুমা,লামাচা, খুনতাতই, দুসওমা, ধুতরা বা দুতারা, চেবালা, সাকবংমা এবং আরো অনেক। ঢেকিতে বা হামামদিস্তায় পিষে, পিণ্ড করে শুকিয়ে রাখা হয়। গরম ভাতে মুলি মেশালে সত্ত্বর পচন ধরে।

২. আবরণ ও আভরণ

উচইদের সাবেকি পোশাক স্বল্প ও সরল। তারা নগ্নভাবে চলাফেরা করে না। তাদের চিরাচরিত পোশাক বন্য পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। অতীতে নারী পুরুষ উভয়ে লম্বা চুল রাখত, ঝুঁটি বাঁধত। অলংকার, চুল বিন্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষণীয়। মহিলার চাইতে পুরুষের ক্ষেত্রেই পরিবর্তন যুগান্তকারী। তারা আর লম্বা চুল রাখে না, ঝুঁটি বাঁধে না, অলংকার পড়ে না। কলকারখানায়, দর্জিপাড়ায় তৈরি পোশাক পড়ার প্রবণতা বাড়ছে। নিজ পাড়ার বাইরে, বিদ্যালয়ে, বাজারে বা নগরে সরকারী কাজে যেতে হলে আধুনিক পোশাক চাই।

শৈশবে ছেলে মেয়েরা সাধারণত নিরাবরণ থাকে। কৈশোর কাল থেকে পোশাক ব্যবহার শুরু হয়। লেংটি (কাংসা), গামছা (রিকুত), জামা (কুতাই), পাকড়ী (কাংস) প্রভৃতি পুরুষের পোশাক। মহিলারা পড়ে, পাছড়া (রুনাই), বক্ষাবরণী (রিসা), জামা (কুতাই)। মাঠে কাজের সময় মহিলারাও পাকড়ী (কাংস) পড়ে। শীতে সকলে চাদর (বকি) গায়ে দেয়।

বয়স্কা মহিলারা আজও প্রাচীন অলংকারের ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। কানের উপরিভাগে পড়ে ওয়ারেই, মধ্যে ওয়াখু, তলায় নারাও। গলায় লক ও রামবাও। হাতের বাউলিতে ত, কবজীতে জাকস এবং আঙুলে জাকস্তা। চুলের ঝুঁটিতে সুরাস। পুরুষেরা গলায় পড়ত লক-চেলা, হাতে বজা, ঝুঁটিতে বেথেরা।

অলংকারের উপকরণ আগে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করা হত। হরিণের সিং, বানরের দাঁত, শজারুর কাঁটা, রামকলার বীচি, বাঁশ এসবই ছিল প্রধান উপকরণ। উচই যুবক তার প্রেমিকাকে সযত্নে তৈরি বাঁশের চিরুনি (বেথেরা) উপহার দিত; হরিণের সিং ঘষে সুবাস বানিয়ে দিতে। শজারুর কাঁটা যোগাড় করে দিত। বর্তমানে স্বর্ণকারের দোকান থেকে লোহার, তামার, রূপোর, দস্তার ও সোনার অলংকার কিনে নেয়। উচইদের নিকট উলকি প্রিয় নয়।

৩. আবাস ও নিবাস

উচইরা ছোট-ছোট গ্রামে বাস করে। গ্রামের অবস্থান সুউচ্চ পর্বতেও নয়, একেবারে নীচু জমিতেও নয়। মাঝারি ধরণের উঁচু টিলায় বাস করতে উচইরা ভালবাসে। গ্রামের স্থান চিরস্থায়ী নয়। পরিবর্তনশীল জুম চাষের সহিত পাড়ারও স্থানান্তর ঘটত। পাড়ার স্থান নির্বাচনে কয়েকটি বিষয়ে বিবেচনা করত ঃ ধারে কাছে যেন নদী নালা থাকে, খাদ্য আহরণের সুযোগ সুবিধা থাকে, জুম চাষের জঙ্গলাকীর্ণ টিলা থাকে এবং ভূত প্রেতের উপদ্রব মুক্ত যেন হয়। পাড়াগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট নয়। দুটো পাড়ার মধ্যে ব্যবধান কয়েক কিলোমিটার। গ্রামকে বলা হয় কামি, পাড়া বা বাড়ি। গ্রামের নামকরণ হয় প্রতিষ্ঠাতা গাঁও প্রধানের নামে বা নিকটবর্তী নদীর নামে বা কোন বড় গাছ গাছড়ার নামে বা কোন ঘটনার নামে। এক একটি পাড়া এক-এক সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে গঠিত হত। যেমন উচই পাড়ায় শুধু উচই, রিয়াং পাড়ায় শুধু রিয়াং, কুকি পাড়ায় শুধু কুকি। এমন একটি পাড়ায় পঞ্চাশ-ষাট ঘর লোক বাস করে। এ-বিষয়ে উচই, রিয়াং, তিপ্রা প্রভৃতি সমাজে একটি প্রবাদ আছে ঃ ছয় কুড়ি ছয় ঘর। নৌক কুড়ি নৌক দক।। প্রবাদের মর্মার্থ দাঁড়ায়—সর্বোচ্চ একশ' ছাব্বিশ ঘরের পাড়ায়, ওঝাইর নাই বিশ্রাম আহার-নিদ্রায়।

উচইদের দুটো পাড়া যেমন সংলগ্ন নয়, তেমনি দুটো ঘরও সংলগ্ন নয়। প্রত্যেক পরিবারের জন্য আলাদা-আলাদা ঘর। তবে দুটো ঘরের মধ্যে দূরত্ব কম, মাত্র বিশ-পঁচিশ ফিট। মনোনীত টিলার সমতল পৃষ্ঠদেশে সারিবদ্ধভাবে ঘর তৈরি করা হয়। উচই পাড়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই যে পাড়ার মাঝখানের উঠোনে সারিবদ্ধভাবে আম বা কাঁঠাল গাছ লাগানো হয়। গাছের সারির দু'পাশে মুখোমুখি করে বাস্তুভিটা গড়ে উঠে।

উচই, তিপ্রা, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, হালাম, কুকি, গারো, লুসাই প্রভৃতি সম্প্রদায় অধ্যুষিত পাড়াতে অতীতে তিন ধরণের ঘর বাড়ি দেখা যেত। বসত ঘর, যুবকদের আড্ডাঘর এবং গোলাঘর। গোটা পাড়ার সবে মিলে একটি মাত্র আড্ডা ঘর তৈরি করত। কিন্তু প্রতি পরিবার পিছু একটি বসত ঘর এবং একটি ধান রাখার গোলাঘর। আড্ডাঘর পাড়ার মাঝখানে, গোলাঘর বসতবাড়ি থেকে খানিকটা দূরে এবং বসতঘর উঠোনের দু'পাশে। বন্য জন্তু এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার্থে অতীতে ঘরবাড়িগুলো আরো ঘন সন্নিবিষ্ট ছিল।

উচইদের বাস্তুভিটা আয়তক্ষেত্রাকার। পরিবারের লোক সংখ্যানুসারে ঘর বড় বা ছোট করা যায়। অতীতের যৌথ পারিবারিক ব্যবস্থায় একটি মানানসই ঘরের দৈর্ঘ্য ত্রিশ হাত ও প্রস্থ পনের হাত ছিল। মাটির দেয়াল, টিনের ছাউনি বা ইটের পাকা বাড়ি কারো ছিল না। ঘর তৈরির সমস্ত উপকরণ অরণ্যজ। বাঁশ, বেত, গাছপালা, ছন, বাঁশপাতা; শতাধিক খুঁটির উপর দাঁড় করিয়ে সাত-আট হাত উপরে মাচা তৈরি করা হত। মাচার চার পাশে ঘন বেড়া, উপরে দোচালা ছাউনি, সামনে ও পেছনে মাচার বারান্দা। দৈর্ঘ্যভাগে কোন বারান্দা ও দুয়ার রাখা হয় না। প্রস্থভাগে বারান্দা ও দুয়ার রাখা হয়। জানালা দৈর্ঘ্যভাগের বেড়ার গায়ে-গায়ে। ঘর তৈরির কাজে পাড়া প্রতিবেশীরা একে অপরের সহযোগিতা করত।

উচইরা ঘরকে বলে ওক। ইহা সর্বার্থ সাধক, আশ্রয়স্থল স্বরূপ। রান্না, খাওয়া, প্রক্ষালন, ঘুম, বিশ্রাম, গল্প-গুজব, আদর আপ্যায়ন, বস্তু ভাণ্ডার, পশুপালন সবই এর ভেতর। পেছনের বারান্দায় (নওকচু) মহিলারা তরকারি কাটে, থাল বাসন ধোয়, কাপড় কাঁচে, কাপড় শুকায়, শিশুর পরিচর্যা করে। মাচার নীচে শূকরের খোয়ার ও জ্বালানী কাঠ রাখার ব্যবস্থা। ঘরের কাপড়-চোপড়, যন্ত্রপাতি, ঝুড়ি, বীজ, বিছালি, মোরগের খাঁচা ইত্যাদি এই ঘরেই রাখে। ঘরের এক কোণে রান্না-খাওয়ার বন্দোবস্ত। ঘরের ভেতরেই আবাল বৃদ্ধ বনিতা, বিবাহিত দম্পতিরা পৃথক-পৃথক শোয়ার বিছানা পাতে। সামনের বারান্দায় অতিথি আগন্তুকের বসার, পান তামাক খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। দম্পতিদের জন্য পৃথক-পৃথক কুঠিয়া রাখা হয়।

পুরাতন গৃহ-ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটছে। গোলাঘর আলাদাভাবে আর করা হয় না। আড্ডা ঘর কোন পাড়ায় নেই। পাড়ায় বিদ্যালয়, উপাসনালয়, গোশালা, নব দম্পতির আলাদা ঘর প্রভৃতি গড়ে উঠছে।

৪. সমাজ গড়ন

উচইদের সামাজিক গড়ন সরল। ব্যক্তি-পরিবার-কুল-বংশ-উপজাতি-এই হল উচই সম্প্রদায়ের গঠনের স্তর-বিন্যাস। ১৯৬১ সালের জন-গণনানুসারে ৭৬৬ জন এবং ১৯৭১ সালে ১০৬১ জন ব্যক্তি নিয়ে এ সম্প্রদায় গঠিত। ১৯৮১ সালের সংখ্যা ১৩০৬ জন। পার্বত্য চট্টগ্রামে ও মিজোরামে বসবাসকারী উচইদের সংখ্যা অজানা।

অমরপুর মহকুমার বড় বাড়ি নামক উচই পাড়ায় ১০-১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ দিনাঙ্কে সরজমিনে সমীক্ষা করে দেখা গেল যে ঐ পাড়ার পঞ্চাশটি পরিবারের মোট লোক সংখ্যা ৩১৪ জন। তাহলে গড়ে পরিবার পিছু লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ জন। তার মানে, এই নগন্য সম্প্রদায়টির পরিবার সংখ্যা ১৯৬১ সনে ছিল সামান্য কমবেশি ১২৮টি, ১৯৭১ সনে ১৭৭টি এবং ১৯৮১ সনে খুব সম্ভবত ২১৭টি। সমীক্ষাকালে আরো দেখা গেল যে ৫০টি পরিবারের মধ্যে এক প্রজন্মের বা পুরুষের বা সিড়ির লোক আছে ১টি পরিবারে, দুই প্রজন্মের লোক আছে ২৭টি পরিবারে এবং তিন প্রজন্মের লোক আছে ২২টি পরিবারে। আবার ছোট মাঝারি ও যৌথ পরিবার এই তিন ধরণের পরিবার বর্তমান। বয়োবৃদ্ধদের সাথে আলোচনা করে মনে হল যে যৌথ পরিবার ভেঙে ছোট পরিবার গঠনের দিকে প্রবণতা বাড়ছে। উচইরা পিতৃতান্ত্রিক। নীচে সমীক্ষিত ৫০টি পরিবারের বিবরণ পেশ করা হল।

ক্র. সংখ্যা.	পরিবারের কর্তা	সদস্য	সংখ্যা	প্রজন্ম
১	সর্বশ্রী জুনা উচই	স্বামী, স্ত্রী	২	১
২	সতীরাম উচই	স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা	৪	২
৩	পুন্দিরাম	,,	৫	২

ক্র. সংখ্যা.	পরিবারের কর্তা	সদস্য	সংখ্যা	প্রজন্ম
৪	সোম্বারায় চৌধুরী	স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা	৮	২
৫	কৃতরাম	--	৫	২
৬	ঈশ্বর চন্দ্র	--	৬	২
৭	ধনঞ্জয়	--	৬	২
৮	জগবিশ্ব	--	৩	২
৯	কৃপারাম	--	৫	২
১০	খানতহা	--	৬	২
১১	স্বপন	--	৫	২
১২	মালিরাম	--	৫	২
১৩	বিশ্বচন্দ্র	--	৮	২
১৪	স্বজহাঁ	--	৪	২
১৫	পুনি রায়	--	৫	২
১৬	বাংখতি	--	৪	২
১৭	মানিরাম	--	৬	২
১৮	উষাচন্দ্র	--	৪	২
১৯	বথিচন্দ্র	--	৪	২
২০	হাসরিমনি	--	৫	২
২১	খমন্দ্র	--	৭	২
২২	গয়ারাম	--	৪	২
২৩	দয়াচন্দ্র	--	৫	২
২৪	হাসাচন্দ্র	--	২	২
২৫	চন্দ্রকুমার	--	৭	২
২৬	অমরাং	--	৭	২
২৭	জৈত্যচন্দ্র	--	৪	২
২৮	ক্ষেত্ররাম	--	৫	২
২৯	রসময়	স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, বধু-নাতি	৯	৩
৩০	ইলাবন	--	৮	৩
৩১	ইলাচন্দ্র	--	১৩	৩
৩২	গুণমণি	--	৮	৩
৩৩	মুংখই হা	--	৮	৩
৩৪	আশাচন্দ্র	--	৭	৩

ক্র. সংখ্যা.	পরিবারের কর্তা	সদস্য	সংখ্যা	প্রজন্ম
৩৫	কুবুধন	স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, বধু-নাতি	১২	৩
৩৬	সিয়াচরণ	--	৬	৩
৩৭	গৌরাঙ্গ	--	৬	৩
৩৮	সাজরায়	--	১০	৩
৩৯	নারাই হাঁ	--	৭	৩
৪০	তইদু চন্দ্র	--	৬	৩
৪১	কৃষ্ণচন্দ্র	--	৫	৩
৪২	সেস্ত হাঁ	--	১৩	৩
৪৩	উদয়	মা, বাবা, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা	৬	৩
৪৪	বিত্তরাম	--	৭	৩
৪৫	ঠাণ্ডাচন্দ্র	বাবা, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা	৭	৩
৪৬	বিজয়	মা, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা	৬	৩
৪৭	মঙ্গল কুমার	--	৭	৩
৪৮	আদিরাম	--	৫	৩
৪৯	বিদায় চন্দ্র	মা, স্বামী, স্ত্রী, ভাই, পুত্র, কন্যা	৮	৩
৫০	কর্ণজয়	মা, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, বধু, কন্যা	৯	৪
			৩১৪	

কয়েকজন ব্যক্তি নিয়ে একটি পরিবার গঠিত হয়। কয়েকটি পরিবার নিয়ে হয় কুল। নৃতত্বে ইহাকে band বলে। কুলের আদি পিতা-মাতা কোন কাল্পনিক দম্পতি নয়। এ স্তরে রক্তের বন্ধন শক্ত। অনুকূল পরিবেশে একটি কলাগাছ বা বাঁশ লাগালে যেমন কালক্রমে কলাগাছ বা বাঁশের পরিবার গড়ে উঠে, তেমনি এক দম্পতি থেকে বহু পরিবারের সৃষ্টি হয়। কলাগাছের মুড়া বা বাঁশ ঝাড়ের মতো, মানুষের কুল হলো পরিবারের পরবর্তী সামাজিক স্তর। ধরে নেয়া অমূলক হবে না যে উচই সম্প্রদায় অন্তত পঁচিশটি কুলে বা মুড়ায় বিভক্ত। কিন্তু এসবের নাম পাওয়া কঠিন।

কুলের পরবর্তী উর্দ্ধতন স্তর হল বংশ যা কতকগুলো কুল নিয়ে গঠিত। উচইরা ইহাকে বলে পাঞ্জি। উচই সমাজ বারোটি পাঞ্জি নিয়ে গঠিত। পাঞ্জির ভিতরে ও বাইরে বিবাহ নিষেধ নয়। অন্তঃপাঞ্জি এবং আন্তঃপঞ্জি এই উভয় প্রকার বিবাহ উচই ও রিয়াং সমাজে চলে। নীচে বারোটি পাঞ্জির নাম ও বৈশিষ্ট্য দেয়া হল ঃ

ক্র. সংখ্যা	নাম	বৈশিষ্ট্য
১	পাইংতমা	সবচেয়ে বড় গোষ্ঠী
২	জলাই	উগ্র স্বভাব

ক্র. নং.	নাম	বৈশিষ্ট্য
৩	খিয়াং	আইন বিশারদ
৪	ওয়াকহ	কাদায় থাকতে ভালবাসে
৫	স্কাঁ	লুসাই সম্প্রদায় থেকে আগত
৬	ক্রাইস্নি	রিয়াং সম্প্রদায় থেকে আগত
৭	আপেত	মাছ ধরতে ওস্তাদ
৮	চং প্রেং	বাদ্যযন্ত্র বিশারদ
৯	জলাই তখা	কথা বেশি বলে
১০	জলাই কচা	বাচাল ও গৌরবর্ণ
১১	ওয়াকরং	পাগলা স্বভাবের
১২	তুইসুই ইয়াফা	কচ্ছপের বংশধর

উচইদের গোষ্ঠীর নামের সহিত রিয়াংদের গোষ্ঠী-নামের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই আপেত, চং প্রেং, ওয়াইরেং এবং তুইমুই ইয়াফা-এই চারটি সাধারণ পাঞ্জি বর্তমান। কিন্তু এসব পাঞ্জিগুলো প্রতীক ধর্মী (টোটেমিক) কিনা বলা কঠিন। মাছ, বাদ্যযন্ত্র ও কচ্ছপের নামে গোষ্ঠীর নামকরণ হলেও এরা মাছ, বাদ্যযন্ত্র ও কচ্ছপকে ভক্তি-শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে না। এটুকুমাত্র স্বীকার করে যে অতীতে এসব প্রাণী বা বস্তুর কাছ থেকে কোন বিশেষ উপকার পেয়েছিল। পাইংতমা গোষ্ঠীর প্রভাব-প্রতিপত্তিকে hegemony বলা যায়।

গোষ্ঠীর অব্যবহিত পরবর্তী উর্দ্ধতন স্তর হল উপজাতি। ইহাই সর্বশেষ স্তর। উচইদের সম্প্রদায় দুটো প্রধান বিভাগে বিভক্ত নয়। গোটা সম্প্রদায়টি, নীচ থেকে উপরের দিকে হিসাব করলে, ব্যক্তি-পরিবার-কুল-বংশ-গোষ্ঠী-উপজাতি একইভাবে বিভক্ত। সম্প্রদায়ের গড়ন অনেকটা মন্দিরাকৃতি। নৃতত্বে সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে সমাজ গড়ন হল যথাক্রমে, individual, family, band, lineage, clan, tribe, chiefdom, kingdom.

উচইরা নিজেদিগকে বলে ব্রং, রিয়াংদিগকে সিয়াং, তিপ্রাকে গুরপাই, নোয়াতিয়াকে কতা, লুসাইকে স্কাঁ, মগকে মুখু এবং বাঙালিকে ওয়ানজই বলে।

ব্রিটিশ প্রশাসকরা কিন্তু রিয়াং, উচই প্রভৃতি উপজাতিকে তিপ্রা উপজাতির অন্তর্গত এক একটি গোষ্ঠী বলে মন্তব্য করেছে। এ বিষয়ে তাদের উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

কাপ্তান লেউইন (১৮৬৯) বলেন, "There are four clans of the Tipperah tribe resident in the Chittagong Hill Tracts as follows : The Pooran, the Nowuttea, the Osuie and the Reang. All come originally from Hill Tipperah". কাপ্তান লেউইন তাঁর আরেক গ্রন্থে একই মন্তব্য করেন।

প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেছেন রিজলে (১৮৫১-১৯১১)। তিনিও উচইদিগকে তিপ্রাদের একটি গোষ্ঠী বলে ধরে নিয়েছেন। রিজলের ভাষায়, "The Tipperahs are described in a survey report by Mr. H. J. Reynolds as having strongly marked Mongolian features, with flat faces and thick lips. They are of much the same stature as Bengalis, but their frames are far more muscular and strongly made. Many of them have fair complexions, scarcely darker than a sworthy European. The tribe is divided into a number of septs which are shown in the appendix I (P.139)

Tipperah/Tripra/Mrung

Sub-Tribes	Septs			
Nil	A'.fang	Harbang	Keoya	Puran
	Aiatong	Husoi	Mising	Reang
	Fadung	Jumatiya	Mongbai	Tungbai
	Gaibing	Kakulu	Nowattia	
	Gariang	Kali	Osui	

৫. সংস্কার

সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনযাত্রা কতকগুলো লোকাচার ও লোকবিশ্বাস, প্রথা ও বিধিনিষেধ দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐতিহ্যবাহিত ও ধর্মবিহিত এসব ইতিবাচক ও নেতিবাচক আচার-অনুষ্ঠানকে এক কথায় সংস্কার বলা যায়। উচই সমাজে আচরিত সংস্কারগুলোর সংগ্রহ, সংকলন, সংহতিকরণ ও সংস্করণ হয়নি। অধুনা বহিরাগত প্রভাব সাবেকি সংস্কারের সরলতা নষ্ট করছে।

জাতকর্ম বা জন্মকালীন সংস্কার ঃ নারী-পুরুষের মিলনে গর্ভ সঞ্চার যে হয় এতে তাদের মনে সংশয় নেই। লোকবিশ্বাস কোন সন্তান-সম্ভবা নারীকে যদি কোন প্রেতাত্মা স্বপ্নে দেখা দেয় তবে সেই প্রয়াত ব্যক্তি তার ঘরে জন্মগ্রহণ করবে। গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের উপর অপদেবতাদের নজর থাকে খুব বেশি। অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষার্থে অপদেবতাকে জলের ঘাটে মোরগ বলি দিয়ে তুষ্ট করতে হয়। এই অনুষ্ঠানকে বলে কুবেং বুমি। গর্ভাবস্থায় নারীর খাওয়া-দাওয়ার উপর যেমন একদিকে নিষেধ আরোপিত হয়, তেমনি অপরদিকে কতকগুলো খাবার চাইলে দিতে হয়। এদের বিশ্বাস, মেনী মাছ খেলে শিশুর মুখ বড় হবে, শূকরের লেজের মাংস খেলে শিশু চঞ্চল স্বভাবের হতে পারে, কচ্ছপের মাংস খেলে প্রসবে কষ্ট হবে। এছাড়া, আর যা খেতে চায় তা না দিলে শিশুর মুখ দিয়ে সব সময় লালা নির্গত হবে, অতৃপ্ত কামনা-বাসনা থাকার ফলে।

প্রসবকালে পাড়ার দু'জন অভিজ্ঞ ধাত্রী সাহায্য করে। তাদের বলা হয় কুমাজুক এবং লওমাজুক। কুমাজুক প্রধান ধাত্রী, লওমাজুক সহকারিণী। আর থাকে ওঝা বা অচাই। পুত্র সন্তান হলে ঘরের সামনের বাঁশের পালার চামড়া বা ডলু দিয়ে এবং কন্যা হলে উনানের নিকটের অর্থাৎ পেছনের দরজার পালার ধারালো ডলু দিয়ে নারি কাটার নিয়ম; এরপর স্নানের ঘাটে ওঝা গিয়ে দুটো মোরগ বলি দিয়ে পূজা দেয়। ইহাকে বলে বলম সথম রাইসি। প্রসূতির ব্যবহারের জন্য আলাদা উনান বানাতে হয়। পুত্র হলে পাঁচ কিস্তিতে, কন্যা হলে তিন কিস্তিতে বাহির থেকে মাটি এনে এই বিশেষ উনান তৈরি করা হয়।

প্রসবের পর সপ্তম দিবসে জলের ঘাটে সাত টুকরো হলুদ, ডিম ইত্যাদি নিবেদন করা হয়। সঙ্গে একটি কিশোর থাকতে হবে। সেই কিশোর ডিমটি খেয়ে নেবে।

শিশুর বয়স পঞ্চম বা সপ্তম মাস হলে তখন একটি বড় অনুষ্ঠান, পূজা ও ভোজ হয়। অপদেবতার উপদ্রব রোধে শিশুর কোমড়ে কাল তাগা পড়িয়ে দেয়। মোরগ বলি দিয়ে পূজা হয়। ধাত্রী, ওঝা ও অন্যান্যর আপ্যায়িত হয়।

বিবাহ কালীন সংস্কার ঃ- উচুইরা বিবাহানুষ্ঠানকে বলে কাইলামি। উচই, তিপ্রা, রিয়াং, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রাচীন বিবাহ প্রথার মধ্যে সাদৃশ্য ছিল।

সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রাক্-বিবাহ মেলামেশাকে উচইরা স্বাভাবিক ও সহজ বলেই মনে করে। বিয়ের পর কিন্তু ইহাকে প্রশ্রয় দেয়া হয় না। পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী উচই, তিপ্রা ও অন্যান্যদের এ বিষয়ে মেলামেশা সম্বন্ধে কাপ্তান লেউন মন্তব্য করেন।

হান্টার (১৮৪০-১৯৪০) সাহেবের উক্তিতে লেউনের মন্তব্যই পুনঃধ্বনিত হয়েছে মাত্র। তবে বর্তমানে, বাস্তবে এ ধরণের অবাধ সুযোগ খুব কম। গণিকাবৃত্তি বা আতিথেয়তার নিদর্শন স্বরূপ একই প্রজন্মের অতিথিকে স্ত্রী দিয়ে মনোরঞ্জনের প্রথা এদের মধ্যে নেই। এ বিষয়ে তারা সংযতচিত্ত ও রক্ষণশীল।

জীবন সাথী নির্বাচনে রয়েছে সুযোগ। বাবা ও মেয়ে, মা ও ছেলে, ভাই ও বোন, মামা ও ভাগিনী, কাকা জ্যেঠা ও ভাইঝি এসব ক্ষেত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। এছাড়া, একই বংশ, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ চলে। নিজ সম্প্রদায়ের বাইরে বিবাহ বর্তমানে চালু হয়েছে। সর্বশ্রী কর্ণজয় উচই, আদিরাম উচই, ধনঞ্জয় উচই মানিরাম উচই ও খমন্দ্র উচই পাইংতমা গোষ্ঠীর লোক। তারা প্রত্যেকে নিজ গোষ্ঠীর মহিলা বিয়ে করেছেন। তেমনি আশাচন্দ্র উচই, হামধি মনি উচই ও হাসাচন্দ্র উচই জলই গোষ্ঠীর এবং তাদের স্ত্রীও। অতিরাম উচইর স্ত্রী কিরণবালা দেববর্মা তিপ্রাবংশজাত। ভৃগুরাম উচই'র স্ত্রী হাম্পাতি রিয়াং বংশজ। ফিলিপ উচইর স্ত্রী রমা চিচিম গারো বংশজাত। অমর উচই'র স্ত্রী নিকজি মারাক গারো বংশজাত। কাশীরাম উচই বিয়ে করেছেন জনৈকা বাঙালি মহিলাকে। নগেন্দ্র কুমার ত্রিপুরার স্ত্রী'র নাম শ্রীমতী রমা উচই। ডাঃ রেবিকা উচই-এর স্বামীর নাম শ্রী রাহুল মজুমদার।

সম-উদ্বাহ উচই সমাজের প্রচলিত প্রথা। বহু বিবাহ, দ্বিবর ও শ্যালিকা-বিবাহ প্রথা বিরল নয়। বহু বল্লভার উদাহরণ কোথাও পাওয়া গেল না। বিপত্নিক ও বিধবা পুনঃ বিবাহ করতে পারে।

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রকার মনীষী মনু (৩.২১) আট প্রকার বিবাহ পদ্ধতির কথা বলেছেন, যথা—১) ব্রাহ্ম, ২) দৈব, ৩) আর্ষ, ৪) প্রাজাপত্য, ৫) আসুর, ৬) গান্ধর্ব, ৭) রাক্ষস এবং ৮) পৈশাচ। উচই সমাজেও প্রায় সমবিধ বিবাহ-বিধি বিদ্যমান, যথা—১) সেবায় তুষ্টি বিধানে বিবাহ (চামারি কাইলামি), ২) মুদ্রা ও দ্রব্য প্রদানে বিবাহ (দাফা বাই কাইলামি), ৩) ভালবাসার ফলে বিবাহ (মামলা। মুচলাইয়ে কাইলামি), ৪) পালিয়ে গিয়ে বিবাহ (তুই কাইলামি), ৫) জোর-জরবদস্তি করে বিবাহ (ফাঁ কাইলামি), ৬) বিধবা বিবাহ (সাইকতঙ্গ), ৭) শ্যালিকা বিবাহ (ওম প্রাংজুকমান কাইলামি), ৮) দেবরকে বিবাহ (ওম প্রাররুহান কাইলামি)। ঋষি মনু যেমন আট প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রথম চার প্রকার বিবাহকে শালীন প্রথা বলে গণ্য করেছেন, তেমনি উচই সমাজেও উপরে বর্ণিত আট প্রকার বিবাহের মধ্যে চার প্রকার বিবাহকে সুনজরে দেখা হয়।

উচই সমাজে ঘটককে বলে কক সুনাই। তিনি বর ও কনে এবং উভয় পক্ষের অভিভাবকের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন। তিনি উভয়ের বন্ধু। তাঁর দৃষ্টিতে প্রত্যেক বর বীর পুরুষ, প্রত্যেক কনে রূপসী। মৃদুভাষী, মিষ্টভাষী, মধ্যবিত্ত, সৎ, পরাহিতাকাঙ্ক্ষী এবং রসবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি কক সুনাই বলে খ্যাতি অর্জন করে। বর-কর্তা আদ্রাং হলেন সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় নেতা।

বসন্তকালে (ফাল্গুন-চৈত্র) বিয়ের প্রশস্ত সময় বলে মনে করা হয়। শুভদিনে, শুভক্ষণে (ভোরে) ঘটক ও মুষ্টিমেয় অভিভাবক সহ বরের মা-বাবা কনের বাড়িতে যায়। মোরগ, মদ, পান তামাক কনের মা বাবাকে প্রণামী হিসেবে দিয়ে প্রকাশ্যে ও সামনা-সামনি তাদের মতামত চাওয়া হয়। বলাবাহুল্য, ঘটক আগেই অপ্রকাশ্যে উভয় পক্ষের সম্মতি বিনিময় করে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখে। কনের বাবা গাঁও প্রধান ও অন্যান্য বয়স্কদের নজরে আনে প্রস্তাবের কথা। সেদিনই বসে বৈঠক। ঠিক হয় দিন-ক্ষণ। নির্দিষ্ট দিনের আগের দিন সন্ধ্যাবেলা বেজোর সংখ্যক সমবয়সী বন্ধু নিয়ে বর কনের পাড়ায় যায়। বাদ্য ভান্ডে, হাসি তামাসায় সারা পথ উৎসবের রূপ ধারণ করে। বর-যাত্রীদের সরাসরি কনের ঘরে উঠতে মানা। ঐ পাড়ারই অন্য ঘরে রাত কাটায়। এজন্য কিছু দক্ষিণা দিতে হয়। ঐ ঘরের মালিক বা সমবয়সীদিগকে। পরের দিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে জেগে বর-যাত্রী দল বাজনা বাজিয়ে গান করতে-করতে কনের ঘরের উঠানে দাঁড়ায়। কনের পক্ষের দল উপরে মাচায় দাঁড়িয়ে গান করে। অভ্যর্থনা জানায়। চলে গানের লড়াই। লড়াইতে স্বেচ্ছায় হারে কন্যার পক্ষ, উপরে উঠে আসে বর যাত্রীরা। তখন লুকিয়ে থাকে কনে। বরের বন্ধুরা পাতি-পাতি করে খুঁজে বের করে কনেকে। ঘরের লক্ষ্মী-পাতিলের সামনে সাজানো বিছানায় বর-কনেকে শুইয়ে দেয়। বর কর্তা এক ঘটি জল উভয়ের গায়ে ছিটিয়ে লজ্জা সংকোচ দূর করে। অতঃপর ওঝা পবিত্র জল ছিটিয়ে মন্ত্র

উচ্চারণ করে। উপদেশ দেয় যাতে একে অপরকে ভালবাসে, পিতামাতা, শ্বশুর-শাশুড়িকে যেন সেবা-যত্ন করে, ছোটদের যেন আদর করে, যেন ছাড়াছাড়ি না হয়। আর্শীবাদ করে। পাথরের মত দীর্ঘজীবি, তুলারমত সাদা চুল হলেও যেন বেঁচে থাকে, পারস্পরিক ভালবাসার অভাব হলে যেন লংকার মত, জালা পোড়া করে উভয়ের অন্তর। এরপর অভিভাবকরা আর্শীর্বাদ করে। নবদম্পতি গুরুজনদের প্রণাম করে। তারপর ভোজ, পানাহার । বৈদিক সপ্তপদীয় প্রার্থনার সাথে এক্ষেত্রে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তখন বেজে উঠে মধুর গীত-বাদ্য।

বিবাহকে পবিত্রজ্ঞানে জীবন কাটানো সমাজ-অভিপ্রেত। কিন্তু তবু মাঝে-মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটে। বিচ্ছেদের সুর বেজে উঠে। বিবাহ বিচ্ছেদকে বলে কক লাইমা। বিভিন্ন কারণে তা ঘটে, যেমন অক্ষমতা, দুর্ব্যবহার, বন্ধ্যাত্ব, অন্যে আসক্তি, দুরারোগ্য ব্যাধি। ছাড়াছাড়ির লক্ষণ প্রকাশ পেলে প্রথমে হিতাকাঙ্ক্ষীরা বুঝাতে চেষ্টা করে। তাতে কাজ না হলে, আনুষ্ঠানিকভাবে গাঁও পঞ্চায়েতের বৈঠক বসে। বৈঠকে সাব্যস্ত অপরাধীর জরিমানা ৬০্ + ৩০্ + ১্ + ১টি শূকর। নির্দোষ পক্ষ পায় ৬০্ টাকা। গাঁও প্রধান ১্ + ৩০্। বিচারক মণ্ডলীর ভাগে শূকরের মাংস।

রোগ নিদান ঃ শরীর ব্যাধি মন্দির। রোগের কারণ বহুবিধ। এনিয়ে মানুষ চিরদিন জল্পনা-কল্পনা, গবেষণা করে আসছে। আজও অনেকের বিশ্বাস, অতিপ্রাকৃতিক অভিশাপের অবশ্যম্ভাবী পরিণামফল রোগ। উচইরাও এ ধরণের বিশ্বাসের অংশীদার। এর প্রতিকার রুষ্ট দেবতাকে পূজা, বলিদান, মন্ত্র-তন্ত্র, তাবিজ ধারণ দ্বারা। কখনো সেবাবলে, কখনো তন্ত্রে রোগ ও বিপদ মুক্তির প্রয়াস আবহমান কাল ধরে চলছে। বিষ্ণুপুরাণে ত্রিতাপের (আধি-আত্মিক, আধি-ভৌতিক, আধি-দৈবিক) বর্ণনা আছে।

কতিপয় রোগের ক্ষেত্রে উচইদের শব্দভাণ্ডার আছে, যেমন—আমাশয়=ধিপংতই, জ্বর=লুম, সর্দি=কংরাই, মাথাব্যথা=মুখু সামি, ফোঁড়া=কুলা, খোস-পাচড়া=বর্সিক্র, বসন্ত=বর্সি, দাউদ=খাস, হারভাঙ্গা=মাক্রেং বাইমি, বন্ধ্যাত্ব=বাঞ্জী ইত্যাদি। যেকোন রোগকে সাধারণ কথায় বলে কসা। কোন পিচ্ছিল জায়গায় আঁছড়ে পড়লে মনে করা হয় স্থানটি দোষা। সেখানে একটি মোরগ শাবক বলি দেয়া হয়। মহিলার বন্ধ্যাত্ব দূর করার উদ্দেশ্যে কাঁকড়ার গর্তের সামনে মোরগ শাবক বলি দেয়। শরীরের কোথাও কাটা ঘা থাকলে, লোক বিশ্বাস, শিশি নামে এক অপদেবতা দেহে প্রবেশ করবে। তাই দ্রুত প্রতিকার করা হয়। দুটো পাহাড়ের মধ্যে সরু পথ বা সুড়ঙ্গ থাকলে তা দেবতাদের গতিপথ বলে বিশ্বাস। সে পথে হাঁটলে রোগ শোক অনিবার্য। রামধনুর ছায়া যে জলে পড়ে তা ব্যবহার করা বিপজ্জনক, কেননা রামধনু হল চকলেং নামক এক অতিকায় সাপ।

মৃত্যুকালীন সংস্কার ঃ জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, মৃত্যু-এই চার অবস্থা স্থূল দেহধারী জীবের জীবনে অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেকটি অবস্থার সহিত নানা বিচিত্র সংস্কার বিভিন্ন মানব সমাজে প্রচলিত

আছে। উচই সমাজে প্রেত-ক্রিয়া এরূপ ঃ মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রয়াতের পায়ের নিকট এক নিঃশ্বাসে একটি মোরগ-শাবক আছাড় দিয়ে বলি দিতে হয়। লোক বিশ্বাস, মোরগের আত্মা প্রয়াতের আত্মার সাথী হয়ে পরলোকে যাবে।

জীবদ্দশায় কোন ব্যক্তি যাদের সহিত ঝগড়া, বিবাদ, মারপিট, খুন, জখম করেছিল, তাদের বিদেহী আত্মা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য অপেক্ষমান। প্রয়াতের আত্মা আক্রান্ত হলে মোরগের আত্মা সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। যাওয়ার পথে আছে পথের উপর আড়াআড়িভাবে শোয়ানো একটি বড় গাছের কাণ্ড (বুফাং কেবিং)। তা অতিক্রম করে লারিমা নামক এক স্নেহশীলা দেবীর হাতে রান্না করা ভাত খেয়ে চিরকালের জন্য বিদায় নেয় ইহলোক থেকে। মৃত ব্যক্তির দেহে তেল সাবান মেখে স্নান করানো হয় এবং সামনের দরজার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখে। প্রয়াতের পরনে নতুন কাপড়, মুখে লাল সূতা, মাথায় পাগড়ি, কানে শজারুর কাঁটা, সামনে কলাপাতায় খাবার, ধূপ বাতি, ফুল ও কাপড়-চোপড় দেয়া হয়। আত্মীয় স্বজনরা নাচে-গানে কীর্তনে, প্রাচীন উপাখ্যান বলে, মৃতের স্মৃতিচারণ করে সারারাত কাটিয়ে দেয়। পোড়ানো হয় দিনের বেলায়। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর মুহূর্ত থেকে মুখাগ্নি করা অবধি কেউ না কেউ প্রয়াতের দেহের পাশে থাকতেই হয়। অন্যথায় কোন অপদেবতা, ভূতপ্রেত, বুড়া দেবতা প্রয়াতের দেহে ভর করলে পোড়ানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

সাধারণত নদীর তীরে শ্মশান তৈরি করে। খানিকটা স্থান পরিষ্কার করে কাঠ সাজায়। পুরুষ হলে পাঁচ প্রস্ত এবং মহিলা হলে সাত প্রস্ত কাঠ সাজিয়ে, তার উপর লাশকে শোয়ায়। পুরুষ হলে উপুড় করে, মহিলা হলে চিৎ করে। উভয়ের মাথা কিন্তু নদীর জলের গতিমুখী রাখার নিয়ম। অতঃপর চিতার চারিদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করবে প্রথমে প্রয়াতের পুত্র বা নিকট আত্মীয়, পরে অন্যরা। সাতবার জ্বলন্ত মশাল দিয়ে মুখাগ্নি করে। বাড়ি থেকে শ্মশান, শ্মশান থেকে বাড়ি আসা পর্যন্ত কীর্তন চলে, পথে চাল, খই, মুড়ি ছিটিয়ে দেয়। ফেরার পথে মাঝপথে ৭টি দাগ কাটে যাতে ঐ দাগ অতিক্রম করে প্রেতাত্মা গ্রামে না আসে। পরদিন চিতা ধুয়ে অস্থি সংগ্রহ করা হয়। পৌষ সংক্রান্তি না আসা পর্যন্ত তুলসী তলে বা একটি ক্ষুদ্র ঘরে বাঁশের চোঙে অস্থি রাখে এবং প্রত্যহ যৎকিঞ্চিৎ খাবার নিবেদন করে। সাতদিন অশৌচ পালন করে। অশৌচ কালে তেল সাবান ব্যবহার নিষেধ। ক্ষেরীকর্ম নিয়ে অন্যকারো গৃহে প্রবেশ নিষেধ। আমিষ খাওয়া নিষেধ।

সপ্তম দিন সন্ধ্যাবেলা চিতার নিকট একটি ছোট মাচা-ঘর (সুমাংনক) তৈরি করে; তাতে কলা পাতার উপর চালের গুড়ো বিছিয়ে দেয়। লোক বিশ্বাস ঃ প্রয়াত পর-জন্মে যে-প্রাণী হিসেবে পুনঃজন্ম পাবে, সেই প্রাণীর পায়ের ছাপ ঐ পাতায় রক্ষিত চালের গুড়োয় পড়বে। সপ্তম দিন সাধ্যমত শ্মশান বন্ধু ও জ্ঞাতি ভোজন করানো হয়। উচইরা কর্মফলে ও পরজন্মে বিশ্বাসী। পৌষ সংক্রান্তিতে গোমতীর উৎসধারা তীর্থমুখের পবিত্র বারিতে পূর্ব পুরুষের উদ্দেশ্যে স্নান-তর্পণ করে অস্থি বিসর্জন দেয়া হয়।

৬. অবকাশ - বিনোদন

মানুষ পেট-সর্বস্ব প্রাণী মাত্র নয়। পেটের ও মনের চাহিদা একই ব্যক্তিতে সহাবস্থান করে। মানুষ কেবল আর্থিক পশু নয়। ঘূর্ণায়মান সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না নিয়ে জীবন। সুখ-দুঃখের প্রকাশ দেশ-কাল-পাত্র ভেদে পৃথক হতে পারে। সব সমাজে অবকাশ যাপনের জন্য বিভিন্ন ধরণের বিনোদনের ব্যবস্থাও পরিবর্তিত হয়। উচইরা ইহার ব্যতিক্রম নয়। তাদের মধ্যে খেলাধুলা, আড্ডা, নাচ, গান, গল্প, ধাঁধা, হিতোপদেশ প্রভৃতির প্রচলন আছে।

খেলাধুলা ঃ উচই সমাজে বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলা বর্তমান। কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের উপযোগী এসব খেলাধুলোয় বিনোদন, দৈহিক ও বৌদ্ধিক চর্চা হয়। পশু-পাখির স্বভাবের অনুকরণে এবং বয়স্কদের কাজকর্মের অনুকরণে বহু ক্রীড়ার উদ্ভব হয়েছে।

কাক, বউ কথাকও, কোকিল, টিয়া, ময়না পাখির কুহরানুকরণে ডাক কৈশোরে প্রায় সকলেই দেয়। ব্যাঙের লাফের মতো লাফিয়ে চলতে কিশোর-কিশোরীরা ভালবাসে। শূকর-শাবকের মতো মাটিতে গড়াগড়ি যেতে ওরা আনন্দ পায়। মোরগের মতো কখনো যুদ্ধ করে (তকলা জংলাইমা), ছাগলের মতো দু'জনের মাথায় ঠেলাঠেলি করে; ভ্রমরার মতো উড়তে চেষ্টা করে। মায়ের রান্নার অনুকরণে নকল ঘর কন্না (সংজে থুংলাইসি) করে। দোলনার তালে-তালে দোলতে কৈশোরেও মন চায়। তাই শক্ত ডালের নীচে দড়িতে বাঁশ বা গাছের টুকরো বেঁধে দোলে। কলাপাতা চিড়ে কাপড় বুনে (রিতাও সুমি)। শিকারির বন্দুকের মতো বাঁশ দিয়ে বন্দুক বানায় (থান থামা ওয়াসা); রণপাতে (ওয়াখন) উঠে দ্রুত বেগে হাঁটে। সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকোচুরির (হাইচিং ফেরাই ফুমি) অভিজ্ঞতা প্রায় সকল কিশোরের। চোখ বেঁধে সাথিকে খুঁজে বের করার খেলা (চংলাই যা ফুসি) বেশ প্রিয়।

যুবাকালে খেলার নমুনা পাল্টায়। লাটিম খেলা (চু) এবং ঘিলা খেলা (সিয়ই) এ বয়সের প্রধান ক্রীড়া। এছাড়া, বাঁশ ঠেলাঠেলি; খুঁটি টানাটানি, কুস্তি, পিঠে পিঠ লাগিয়ে একে অপরকে উত্তোলন করার প্রতিযোগিতা যুবকদেরই খেলা। বুদ্ধি ও সাহসের দরকার আর কয়েকটি খেলায় যেমন কাংকাস বা ধারিয়া বান্ধা, মুসা-মাস বা বাঘ-ছাগল এবং দুদু বা হাডুডু। ঘিলা খেলা (সুকই/সুয়ই/সিয়ই/সুই) পূর্ব ভারতের বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে, যেমন—লুসাই-কুকি, মণিপুরি, লাখের এবং নাগা। ত্রিপুরার তিপ্রা, রিয়াং, হালাম, জমাতিয়া, নোয়াতিয়াদের মধ্যে তো আছেই।

আড্ডাখানা ঃ অতীতে একদিকে উদ্যান, বাজার, ছবিঘর, চায়ের দোকান, রেস্তোরাঁ, সভা-সমিতি প্রভৃতির অভাবে, অন্যদিকে প্রতিরক্ষা ও জুম চাষে যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজনে প্রত্যেক পাড়ায় একটি করে আড্ডাখানা ছিল। উচইরা ইহাকে বলে ছিকলা জালাই নৌক। তিপ্রারা বলে ছিকলা মিছিপ নৌক, রিয়াংরা দুয়াইং নৌক, গারোরা নৌক ফান্তি, মলসমরা নুংগিয়া কাইয়ান, লুসাইরা জৌলবুক, জমাতিয়ারা থোতাই থুলাইয় এবং কাইপেংরা বলে নংগিয়ান।

অন্যান্য উপজাতীয় আড্ডাঘরের মতো উচইদের ছিকলা জালাই নাক পাড়ার মোটামুটি মাঝখানে নির্মাণ করা হত। আকারে ও আকৃতিতে ইহা সাধারণ বসত-ঘর সদৃশ। অবিবাহিত যুবকরা থাকত, ঘুমাত, গল্প করত। যুবতীদের জন্য আলাদা আড্ডাঘর ছিল না। যুবতীরা ছিকলা জালাই নাকে যেত, গল্প গুজব করতে পারত। কিন্তু ঘুমাতে পারত না।

ছিকলা জালাই নাক ছিল উচই যুবকদের প্রাণকেন্দ্র। গ্রাম প্রতিরক্ষায় পুলিশ ফাঁড়ি স্বরূপ। কর্মব্যস্ত, প্রাণরসে ভরপুর ছিল এই মিলনায়তন। বাঁশি, সারিন্দা, দোতারা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ঝংকারে, প্রাচীন উপাখ্যান কথনে, ধাঁধা প্রবাদের চর্চায়, জুম চাষের প্রয়োজনীয় যৌথ শ্রম বন্টনে, বন্য পশুর ও শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে, ছিকলা জালাই নাক ছিল জম জমাট।

প্রাচীণকালে উচই, তিপ্রা, রিয়াং, নোয়াতিয়া, হালাম, লুসাই, মলসম, কাইপেং, গারো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের গ্রামে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা ছিল। বয়স্কদের নিয়ে ছিল গাঁও পঞ্চায়েত। তেমনি যুবকদের মধ্যে দলপ্রধান, উপপ্রধান ইত্যাদি ছিল। আড্ডাঘরের প্রমুখকে বলা হত জালাই মুক্রুক। যুবনেতা ছিকলা মুক্রুক বলে পরিচিত। আড্ডাঘরের প্রমুখ ও যুবনেতা একই ব্যক্তি। যুবকদের ছোটো খাটো ঘটনার বিচার ঐ নেতা করত।

গান ঃ উচই, তিপ্রা, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, হালাম, কুকি, লুসাই, মগ, চাকমা প্রভৃতি সমাজে প্রতিভাধর শিল্পী আছে। শিক্ষা ও পরিবেশের অভাবে অতীতে এমন বহু শিল্পীর খ্যাতি আঞ্চলিক গণ্ডির বাইরে যেতে পারেনি। শিক্ষার প্রসার, সাংস্কৃতিক সচেতনতা, পত্র পত্রিকার বহুল ব্যবহার ও আকাশবাণীর মারফত অধুনা পল্লি কবিদের প্রতিভার স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে।

বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন ধরণের গান গাওয়ার রেওয়াজ উচই সমাজে আছে। জুমের বন কাটার সময়, বীজ বপনের বেলায়, নিড়ানিতে, ফসল পাহারা দিতে, গরু চড়াতে, বিবাহ বাসরে, পূজা পার্বণে, নবান্নে, আড্ডাঘরে অবকাশ কালে, ভাবাবেগে গানের সুর ধরে আবাল বৃদ্ধ বনিতারা। গানগুলোকে এভাবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে—কর্ম-সংগীত, প্রেমগীতি, ধর্মীয়গীতি, রাজনৈতিক গান, নৈসর্গিক গীতি ইত্যাদি। নবান্নের সময় কবিগানের লড়াই বসত সমাজপতির গৃহের আঙ্গিনায়। অবসর সময়ে বিকেলে কাশীরাম দাসের রচিত মহাভারতের সুর ভেসে আসত পার্বত্য চট্টগ্রাম আর ত্রিপুরার গভীর জঙ্গলে বসবাসকারী কোন উচই, তিপ্রা, রিয়াং, নোয়াতিয়া বাড়ি থেকে। বর্তমানে রবীন্দ্র সংগীত, ভজন, কীর্তন, বিশেষত ছায়াছবির গানের জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

নাচ ঃ উচই সংস্কৃতিতে নাচের প্রাধান্য নেই। তাই বলে নাচ বিবর্জিতও নয়। গড়িয়া পূজা নামে বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে সপ্তাহব্যাপী এক ধর্মীয় উৎসবে নাচ-গানের সর্বজনীন উপলক্ষ্য আছে। এছাড়া স্বাধীন ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আগরতলায় ও নয়াদিল্লিতে এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে মহকুমা শহরে সরকারি উদ্যোগে নাচগানের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এতে বিভিন্ন জাতি-উপজাতির লোক অংশগ্রহণ করে। লোক সংস্কৃতির পশ্চাতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ফলে মৃত-প্রায় এসব সাবেকি সংস্কৃতির ধারা পুনর্জীবিত হতে পারে।

নাচে যুবক যুবতী ও প্রৌঢ়রা অংশগ্রহণ করে। নাচের বিশেষ পোশাক, সাজ সজ্জা নেই। নাচের তালে-তালে কণ্ঠ সংগীত ও যন্ত্র সংগীত বাজে। সমবেত নাচই বেশি। একক নাচ নেই বললেই চলে। শিল্পী কখনো চক্রাকারে, কখনো দুটো সরল সারিবেঁধে নাচ পরিবেশন করে। এদের নাচে আঙুলের মুদ্রার ব্যবহার কম। পায়ের ও কোমড়ের দ্রুত লয় লক্ষ্য করার মতো। জুমের বিভিন্ন কাজে, গৃহ কর্মের এবং পশু-পাখির ব্যবহার নাচের তাল লয় মুদ্রায় প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত হয়।

লোক সাহিত্য ঃ ত্রিপুরার উপজাতীয় সংস্কৃতির ভাণ্ডারে বিবিধ রতন আছে। এর অন্যতম শাখা হল লোক সাহিত্য যার প্রশাখা হল গল্প, উপাখ্যান, রূপকথা, অতিকথা, ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনি, গান, প্রবাদ, প্রবচন, হিতোপদেশ, ধাঁধা, ছড়া ও লোক বিশ্বাস। তিপ্রা, রিয়াং, উচই, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া প্রভৃতি সমাজের লোক সাহিত্যের মধ্যে সাদৃশ্য ও নৈকট্য আছে। আছে আঞ্চলিক পার্থক্যও।

কাহিনী ঃ পুরাকালে উচই রাজা ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ছিট-গ্রস্ত, পাগলাটে। কারণ অনুসন্ধান করতে নিয়োগ করা হল দৈবজ্ঞ জ্যোতিষ শাস্ত্রী। তিনি অনেক গণনা করে সিদ্ধান্তে এলেন এই রাজা পূর্ব জন্মে কুকুর ছিলেন। কুকুরটি মরার পর কাক, চিল প্রভৃতি পাখি তার মাংস খায়। একটি চিল একটি বটগাছের কোটরে বসে মাংস খেয়েছিল। কোটরে এক টুকরো হাড় পড়ল। কোটর বুজে গেল; সেই হাড় ভেতরে রয়ে গেল। তাই বাতাসে তুফানে ঝড়ে গাছটি কাঁপলে রাজার মাথাও নড়ে চড়ে। প্রতিকার, গাছটিকে কেটে ফেলা। সামন্ত, পাত্র, মিত্র নিয়ে রাজা রওনা হলেন গাছটিকে কেটে ফেলতে।

যেতে-যেতে রাজা থুথু ফেললেন। থুথু পড়ল পাশের নদীতে। সে থুথু গিয়ে পৌঁছল সমুদ্রে। সমুদ্র থেকে সমুদ্রের তলদেশে বসবাসকারী রাজবাড়িতে। সে থুথু তথাকার কন্যার নজরে গেল। এত সুগন্ধ যুক্ত থুথু দেখে কন্যা ঐ ব্যক্তিকে দেখতে ও বিয়ে করতে চাইল। সমুদ্র রাজ মেয়েকে বললেন, থুথু উচই রাজার মুখের। এক্ষণে তার মাথা খারাপ। সমুদ্র তীরের বৃহৎ বটগাছটি কেটে ফেললে তার মাথা ভাল হবে। তখন পাকড়াও করে তোমার সাথে বিয়ে দেব। গাছ কেটে রাজা বাড়ি ফিরছেন। সাথে, অনেকের মধ্যে গনৎকার ছিলেন। তিনি সমুদ্র-কন্যার মনের বাসনা ও সমুদ্র-রাজের অভিসন্ধি বুঝে ফেললেন। তাই রাজাকে বললেন পেছন ফিরে না তাকাতে। তাকালেই কোন অঘটন ঘটবে। উচই রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সমুদ্র-রাজ বহু বড়-বড় মাছ, তিমির, হাঙর দেখাতে লাগলেন। তাতে কাজ হল না। এবার ঝড় তুফান বিদ্যুৎ চমক সৃষ্টি করলেন। রাজা ভয়ে ভীত। তাকালেন পেছনে। সঙ্গে সঙ্গে নৌকা ভেঙে দু'টুকরো। যে অংশে রাজা ছিলেন তা গেল জলে ডুবে। রাজা গিয়ে পড়লেন পাতালপুরীতে। রাজকন্যার সাথে বিয়ে হল।

নৌকা ডুবার আগে রাজা তার হাতের আঙুলের আংটি নিক্ষেপ করে দিলেন মন্ত্রীর হাতে।

বললেন, এ আঙটি যার আঙুলে লাগে সেই যেন রাণীকে বিয়ে করে রাজা হয়। অনেক খোঁজাখুজি হল। কারো আঙুলে ঠিক হয় না। শেষটায় দেখা হল, মন্ত্রীর আঙুলেই খাপ খায়। এতে রাণীর সন্দেহ হল। ভাবলেন রাণীর ও রাজ্যের লোভে মন্ত্রী ষড়যন্ত্র করে রাজাকে হত্যা করিয়েছে। রাণী মন্ত্রীকে মারতে, কাটতে উদ্যত হলেন। মন্ত্রী ত্রিপুরায় পালিয়ে এসে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করল।

সেই মন্ত্রীই কালক্রমে হল রিয়াং সম্প্রদায়ের রাজা। আর উচই রাজা যে পাতালপুরীতে গেলেন আর ফিরলেন না। সেই অবধি উচই সমাজে আর রাজা নেই। উচইদের বিশ্বাস উত্তর দেশে অর্থাৎ ত্রিপুরার কোথাও লোহার তৈরি একটি কলাগাছ আছে। সাদা হাতীর পিঠে চড়ে সৈন্য সামন্ত নিয়ে তলোয়ার হাতে উচই রাজা পাতাল থেকে উঠে আসবেন কোনো একদিন। দেশে যবে দীর্ঘ ও প্রশস্ত রাস্তা ঘাট বের হবে, হাট-বাজার অসংখ্য হবে, গাড়ি ঘোড়া ছুটবে তখনই রাজার আবির্ভাবের পূর্বাভাস সূচিত হবে। পথে উদয়পুরের ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দিরের সিঁড়িতে তলোয়ারে ধার দেয়া হবে। রাজা গণহত্যা (চভা/চেভা) করে লোকক্ষয় করাবেন। রাজার বাহন সাদা হাতী খাবে সেই কলাগাছ। অতঃপর উচইদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

রূপকথা ঃ উচই সমাজে এক বীর পুরুষ ছিল। নাম শুলং জাব্রীহা। গরিবের ঘরে জন্ম। কৈশোরে হয় অনাথ। দুর্ভাগ্যবশত সে-গ্রামের সর্দার ছিল বদ মেজাজি। তাই মা কিশোর পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামান্তরে চলে গেল। বনের ফল-মূল, শাক-সবজি আহরণ করে কোন মতে সংসার চলে। ক্রমে শুলং জাব্রীহা যৌবনে পা দিয়েছে। এমন সময় মা মারা গেল। মনের দুঃখে বনে যাবে শুলং জাব্রীহা। পথে দেখা হল এক অতি দীর্ঘ দেহী ব্যক্তির। নাম জাতিক্লহা। ওর পা গুলো খুব লম্বা-লম্বা। ওর সাথে বন্ধুত্ব হল। দুই বন্ধুতে পথ চলা শুরু। কিছু দূর যাওয়ার পর-দেখা আরেক ব্যক্তির সাথে যার কানগুলো ডালার মত বড়। নাম খণ্ডু বালিংহা। তিন বন্ধুর্তে আবার যাত্রা। পথিমধ্যে এবার এমন একজনের সাথে দেখা হল, যার পায়ে পা ঘষলেই আগুন উৎপন্ন হয়। নাম জাতি হকচুংহা। চার বন্ধুতে ঘুরতে লাগল। দেখা হল দীর্ঘ হাত যুক্ত একজনের। নাম জাপা ক্লহা।

এদিকে রাত হয়ে গেল। কোথাও লোকালয় নেই। দৈবচক্রে বনের মধ্যে এক বাড়ি পেল। বাড়িতে এক বুড়ি থাকে। ওরা জানত না যে, বুড়ি একজন রাক্ষসী। বুড়ির ঘরে নেই খাবার, নেই আগুন। ওরা বন থেকে শাকসবজি সংগ্রহ করে দিল। পা ঘষে আগুন উৎপন্ন করল। বুড়ি রান্না করে খাওয়াল। ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে পাঁচ বন্ধু ঘুমিয়ে পড়ল। গভীর রাত্রে রাক্ষসী চার বন্ধুকে মেরে ফেলল। শুলং জাব্রীহা জেগে উঠায় বেঁচে গেল। তার সঙ্গে সব সময় একটি দা থাকত। বন্ধুদের আত্মা দা-এর মধ্যে আটকে রেখে দিল। রাক্ষসীকে পাকড়াও করে বাধ্য করল বন্ধুদের জীইয়ে দিতে। রাগে বন্ধুরা প্রস্রাব করে দিল রাক্ষসীর ঘরে। এত বেশি পরিমাণ প্রস্রাব করল যে, রাক্ষসী ভেসে গেল। ভাসতে-ভাসতে ঠেকল এক রাজবাড়ির কাছে।

সেখানে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে, পাঁচ বন্ধু অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়াল। পথে পড়ল প্রকাণ্ড এক বট গাছ। বটগাছটির কাণ্ড থেকে পাঁচটি বড় ডালা বেরিয়ে এল। মধ্যডালে শুলং জাব্রীহা; বাকি চার ডালে চার বন্ধু ঘুমাল। পরদিন চার বন্ধু চারদিকে খাবারের সন্ধানে গেল। গাছে রইল শুলং জাব্রীহা। সে-পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক বুড়া, সঙ্গে তার অপূর্ব সুন্দরী কন্যা। শুলং জাব্রীহাকে দেখে বাবা ও মেয়ের ভাল লেগে গেল। অনাড়ম্বরে বিয়ে দিল শুলং জাব্রীহার সাথে। নব দম্পতিকে সেখানে রেখে বুড়ো বাড়ি ফিরল।

কালক্রমে এই মনোমোহিনীর সংবাদ সে-দেশের রাজার কানে পৌঁছল। রাজার লোভ হল। যে করে হোক এই কামিনী কাঞ্চন চাই। ঘোষণা দিলেন যে, যে এই রমণী রত্নকে এনে দিতে পারে তাকে যথোচিত পুরস্কার দেয়া হবে। কেউ এগিয়ে আসে না। অবশেষে বুড়িবেশী রাক্ষসী রাজি হল। বন-বালার রূপ ধরে রাক্ষসী শুলং জাব্রীহার কাছে গেল। স্ত্রীর সাথে আলাপ পরিচয় করল। ক্রমেই পরিচয় সখ্যতায় পরিণত হল। রাক্ষসী একদিন বিষ মিশ্রিত পিঠা নিয়ে শুলং জাব্রীহাকে খেতে দিল। জাদুগুণ সম্পন্ন দা দিয়ে স্পর্শ করে কিছু খেলে, তাতে বিষ থাকে না। সে তাই করল। সে-যাত্রা সে বেঁচে গেল। আরেকদিন কথায় কথায় জেনে নিল ঐ দা এর অলৌকিক শক্তির কথা। রাক্ষসী আরো জানল, ঐ দা আগুনে পুড়তে পারলে শুলং জাব্রীহার মৃত্যু অনিবার্য। একদিন শীতকালে তিনজনে আগুন পোহাতে ছিল; রাক্ষসী চট করে ঐ দা খানি আগুনে ফেলে দিল। তক্ষণি শুলং জাব্রীহা অজ্ঞান, অচৈতন্য হয়ে পড়ল। ইত্যবসরে ওর স্ত্রীকে নিয়ে উধাও হল রাক্ষসী।

এদিকে নানা দেশ ঘুরে চার বন্ধু পুনঃ মিলিত হল সেই বটবৃক্ষের তলে। এসে দেখে মধ্যের ডালটি মরে গেছে। বুঝল, একটা কিছু বড় রকমের অঘটন ঘটেছে। যাদু শক্তি সম্পন্ন দা খুঁজে পেলে সমস্যার কূল কিনারা পাওয়া যেতে পারে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেই ছাই এর মধ্যে দা পেল। অন্যতম বন্ধু জাতি ক্লহা সমুদ্রে নেমে একটি তলোয়ার ও একটি পাথর আনল। বন্ধু জাপা ক্লহা পাথরটির উপর দা ধারাতে লাগল। যতই দা ঝক-ঝক করে ততই শুলং জাব্রীহার জ্ঞান ফিরে আসে। কিছুক্ষণ পরে সে বেঁচে উঠল। তার মুখে আনুপূর্বিক সব শুনল বন্ধুরা।

পাঁচ বন্ধু বন্ধু-পত্নী উদ্ধারে সচেষ্ট হল। ঘুরতে-ঘুরতে সেই রাজবাড়ির কাছে এসে পড়ল। লোক মুখে শুনল রাজার নারী-হরণের কথা। অশোক বনে যেন সীতাদেবী। রাজা শর্তানুসারে রাক্ষসীকে রোজ একটি করে লোক আর চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খেতে দেয়। এতে ক্রমে প্রজাদের মনে অসন্তোষ। কিন্তু কিছু করার নেই। বনবাস কালে পঞ্চ পাণ্ডব যেমন এক রাক্ষসকে বধ করেছিলেন, তেমনি এই পঞ্চমিত্র প্রথমে রাক্ষসীকে বধ করল। পরে অত্যাচারী, লোভী, কামাতুর রাজাকে বধ করল; বন্ধু-পত্নীকে উদ্ধার করে প্রজারা শুলং জাব্রীহাকে রাজা করল। সুখে রাজ্য শাসন চলতে থাকল।

গল্প ঃ এক দেশে তেঁতিয়া নামক এক গরিব লোক বাস করত। সে ছিল স্বভাবে সরল এবং একটু বোকা। বনে জুমের কাজ করার জন্য দা তার ছিল না। পরার ভালো কাপড় ছিল না। পাড়া প্রতিবেশীর বাড়ি-বাড়ি খুঁজে পেল একটি পুরোনো দা। বসে অনেক কসরৎ করে দা ধারানোর সময় তার ছেঁড়া কাপড় আরো ছিঁড়ে গেল। বেলা দুপুর হয়েছে। দা হাতে করে নদীর ঘাটে গেল হাত পা ধুতে ও স্নান করতে। জলে নেমে হাত পা ধোয়ার সময় ছেঁড়া কাপড়ের ফাঁকে তার অণ্ডকোষ বেরিয়ে এল। তাতে কামড় দিল একটি চিংড়ি মাছ। ব্যথা পেয়ে রাগে নদীর ঘাটে ঝুলন্ত থাইবাই নামক ফলের গায়ে দিল কোপ। ফলটি পড়ল সোল মাছের গায়ে। সোল মাছ দিল এক লাফ। লাফের চোটে পড়ল কাদায়-গড়াগড়িতে-রত শূকরের গায়ে। শূকর দিল ছুট। শূকর গিয়ে পড়ল বাদুড়ের উপর। বাদুড় ভয়ে উড়ে পালাল। উড়তে-উড়তে রাজার হাতির কান দিয়ে পেটে প্রবেশ করল। হাতি হল অসুস্থ। রাজা হলেন চিন্তিত। ডাক পড়ল রাজ বৈদ্যের। রাজবৈদ্য রোগ নিদান করলেন। অস্ত্রোপচার করে বাদুড় ধরা পড়ল। বাদুড়ের বিচার হবে। বাদুড় বলল এজন্য সে দায়ী নয়। দায়ী শূকর। শূকর বলল সোল মাছ দায়ী। সোল বলল থাইবাই দায়ী। থাইবাই বলল তেঁতিয়া দায়ী। তেঁতিয়া বলল চিংড়ি দায়ী। শেষ পর্যন্ত চিংড়ি মাছ দোষী সাব্যস্ত হল। রাজার শাপে চিংড়ি মাছের দেহ হল লাল।

	প্রশ্ন	উত্তর
ধাঁধা ঃ ১)	কোন্ রাজার পুকুরের জলে ময়লা নেই?	চোখ
২)	কোন্ ব্যক্তির একটি পা, অথচ ছাপ হাজার হাজার?	কলম
৩)	কোন্ ব্যক্তির পা হাজার হাজার, অথচ ছাপ একটিও নেই?	পিঁপড়া
৪)	এক পালার উপর আট চালা ঘর কোন্‌টি?	ছাতি
৫)	কোন্ জিনিস ধরা যায়, কিন্তু দেখা যায় না?	নিজের মাথা
৬)	কোন্ জিনিস দেখা যায়, কিন্তু ধরা যায় না?	আকাশ
৭)	কোন্ লতার আগা কাটলে গোড়া মরে?	নদীর বাঁধ
৮)	কোন্ গাছের ফল মাত্র একটি, কিন্তু লতাপাতা হাজার হাজার?	চুলের খোপা
৯)	কোন্ ধানের এক শীষে একটি গোলাঘর ভরে যায়?	বাতি
১০)	ঘরের ভেতরে ঘর বল্‌তে কি বুঝায়?	মশারি
১১)	কোন্ জিনিস এক পলকে সারা দেশ দুনিয়া ঘুরে বেড়াতে পারে?	মন

সৃষ্টি রহস্য ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্বন্ধে লোক বিশ্বাস —

১) ভূমিকম্পের কারণ হল এই যে পৃথিবী হনুমানের হাতের উপর। হনুমান মাঝে মধ্যে হাত বদল করে। তখনই ভূমিকম্প হয়।

২) রামধনু কি? রামধনু হল স্বর্গের সিঁড়ি। দেবতাদের সাত জন কন্যা আছে। তারা কখনো-কখনো স্নান করতে নামে ঐ সিঁড়ি দিয়ে।

৩) নীহারিকা বা ছায়াপথ কি? ছায়াপথ হল মৃতের গমনের পথ। এই পথ দিয়ে প্রয়াত ব্যক্তি স্বর্গে যায়।

৪) আকাশ আগে অনেক নীচে ছিল। মানুষ আকাশের অংশ কেটে-কেটে খেতো। একদিন জনৈকা মহিলা ধান ভাঙার সময় হামাম দিস্তার লাঠিতে বার-বার ঠেকছিল বলে বিরক্ত হয়ে উপর দিকে সজোরে ঠেলা মারে। সেই থেকে আকাশ এত উর্ধ্বলোকে চলে গেছে। ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, হালাম সমাজে একই বিশ্বাস আছে।

৫) শিলাবৃষ্টি আর কিছুই না, দেবতাদের পাখি মারার সখ হলে গুলতি ছুড়েন। আর বজ্রপাত হল দেবতা কর্তৃক বড় জন্তু জানোয়ার শিকার।

৬) বিদ্যুৎ চমক হল চন্দ্র রাজার সুন্দরী কন্যার কাপড় শাড়ি বদলানোর মুহূর্ত।

৭) বৃষ্টির আগে যে মেঘ গর্জন হয় তা আর কিছুই না, মৃত ব্যক্তিরা তৃষ্ণার্ত হয়ে জলের সন্ধানে ছুটাছুটি, ছড়াছড়ি করে।

৮) গ্রহণ হবার কারণ ঋণ পরিশোধ না করার শাস্তি। চন্দ্র ও সূর্য দুই ভাই। ব্যাঙের কাছ থেকে ধান-চাল ঋণ করে ফেরৎ দেয়নি, তাই ব্যাঙ ধাওয়া করে।

৯) পিতৃ-শাপবশত সূর্যের কিরণ এত গরম। মা-বাবাকে খাওয়ানোর দায়িত্ব দুই পুত্র, চন্দ্র ও সূর্যের। পালাক্রমে তারা সে কাজ করে। কিন্তু একদিন সূর্য বিরক্ত হয়ে খাবারের সাথে বিষ্ঠা মিশিয়ে দেয়। মা বাবা বুঝতে পেরে শাপ দেয়।

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্ম ও পূজা-পার্বণ

আস্তিক্য বুদ্ধিতে অনুরঞ্জিত ও অনুবর্তিত উচই সমাজ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রেও সহমর্মিতা ও সহযোগিতার ভাবটি দীর্ঘ কাল বজায় রেখেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিস্থিতি, ঋতুচক্র-এর সাথে সাজুয্য রেখে নির্ণয় করা হয়েছে চারণ চাষের ও পূজা পার্বনের সময়সূচী। এটি প্রখর বাস্তববুদ্ধির পরিচয়।

সাবেকী আর্থ-সামাজিক রীতি-নীতি অনুসারে প্রতি বৎসর পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র এই চার মাসের মধ্যেই সেরে ফেলা হয় যাবতীয় বারোয়ারী পূজা পার্বন। ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, উচই, হালাম, লুসাই, গারো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সনাতন ধর্মানুষ্ঠান জানার

চাবিকাঠি হল এই চাতুর্মাস্য পালা পার্বন। এই চার মাসেই জুম চাষের তোড়জোড়। এই কয় মাস প্রচন্ড ব্যস্ততার সময়, কর্ম জীবনের গতিবেগ এ সময় তীব্র হয়। জীবনকে সফল করার, পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করার এক প্রবল আগ্রহে তারা হয়ে যায় মাতোয়ারা। শুভ কর্ম পথে তারা ধরে হাত সবাকার, প্রার্থনা করে ঐশ্বরিক শক্তির কৃপা। তাই যুগপৎ চলে দুই কর্মধারা। ৩০শে চৈত্রের মধ্যেই সমাপন করতে হবে জুমে বীজ বপনের কাজ। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ অবধি চলে গড়িয়া পূজার আনন্দ উৎসব। এই ঠাসা কার্যক্রমের সূত্রপাত পৌষমাসে জুমের স্থান নির্বাচনী পারিবারিক পূজা দিয়ে; সমাপ্তি চৈত্র সংক্রান্তিতে গড়িয়াপূজা নামক বারোয়ারী পূজা, নাচ-গান, পান-ভোজন দিয়ে। জীবনদায়ী ধর্ম ও কর্ম এই চার মাসেই করা হয়। বাকী আট মাস বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ, ধর্ম ও কর্ম-শূন্য নয়, এ সময়ের কাজ ক্ষেত্র পাহারা দেওয়া, ফসল তোলা,দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, বিবাহ, বিনোদন, লৌকিকতা বজায় রাখা। পৌষ থেকে চৈত্র অবধি চলে কঠোরতা,কড়াকড়ি, নিয়ম, নিয়ন্ত্রণ। বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ অবধি চলে শিথিলতা, আনন্দধারা, বাঁধনহারা হাসি আর গান। প্রাকৃতিক ঋতুচক্রের আবর্তে আবর্তিত ছিল উচই সমাজ। তাদের স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ-এর ঐতিহ্য প্রবাহমান ছিল দীর্ঘকাল যাবৎ। অধুনা ছন্দপতন ঘট্‌ছে।

স্বভাবের দিক থেকে উচইদের আরাধ্য দেবদেবীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ খল-দেবতা ও মিত্র-দেবতা। নীচে দেবতাদের পরিচয় প্রদান করা হল —

খল-দেবতা

বুড়াহা ঃ বনদেব। ইনি গৃহপালিত পশুর অসুখ বাধিয়ে দেন বা লুকিয়ে রাখেন।

হাইচুমা ঃ বুড়াহার স্ত্রী।

হামপিরা ঃ বুড়াহার পুত্র।

কালপিরা ঃ বুড়াহার পুত্র।

মুখশ্নিরাও ঃ সাত বোন, ওরা সকলে বুড়াহার কন্যা। কনিষ্ঠার নাম রুখম।

লংতরাই মতাই ঃ হস্তী দেবতা।

শনিরাও ঃ ব্যাঘ্র দেবতা।

থুমনাইরাও ও বনিরাও ঃ মৃত্যু সংবাদ বাহক।

শিশি ঃ রোগের দেবতা। কাটা ঘা পেলে তক্ষুণি দেহে প্রবেশ করে।

মিত্রভাবাপন্ন দেবতা

মাইলুমা ঃ ধানের দেবী।

খুনুমা ঃ কার্পাসের দেবী।

তুইবুকমা ঃ জলের দেবী।

নকসু মতাই ঃ বাস্তু ঠাকুর।

লাম্প্রা মতাই ঃ চৌরাস্তার দেবতা।

উচইদের আরাধ্য দেবদেবীর পূজার উপকরণ নানাবিধ, যথা-ফুল, দূর্বা, তুলসী, বেলপাতা, ধূপ, বাতি, কলাপাতা, তেল, সিন্দুর, ফল, শূকর, মোরগ, পাঁঠা, কবুতর, মহিষ, বাঁশ, মদ, মন্ত্র ইত্যাদি। গুরু পরম্পরায় যজমানি বিদ্যা শেখার রেওয়াজ আছে। কিন্তু তাদের মন্ত্রগুলো লিখিত নয়। তবে মন্ত্রগুলোকে স্তবকানুসারে বা অনুচ্ছেদানুসারে সাজালে দেখা যায় মন্ত্রগুলোর অন্তর্নিহিত ভাব এলোমেলো বা অগোছালো নয়। আচমন, আহ্বান, আসনদান, অর্ঘ্যদান, সংকল্প, বরপ্রার্থনা, বিদায়—এসবই তাদের মন্ত্রে আছে। নীচে তাদের ভাষায় মন্ত্রের একটি সাধারণ নমুনা দেয়া হল। সাধারণত স্নানের ঘাটে, নদীর তীরে, উঠোনে, বড় গাছের তলে, চৌরাস্তার মোড়ে, জুমখেতে বা দুটো পাহাড়ের সঙ্গম স্থলে পূজার আয়োজন করা হয়। পূজার দু'একদিন আগে পুরোহিতকে নিমন্ত্রণ করতে হয়।

অ আঘং বুড়াহা নুং যে জাগায় তঙফ

উত্তর অ তঙফ, দক্ষিণ-অ তঙফ

সাকা তঙফ, মাথাং তঙফ

ধ্যানঅ তঙফ, দরবার অ তঙফ

নং ফাইয়ে আচৌ ফাইদি।।

(হে বুড়াদেবতা, আপনি যেখানেই থাকুন, উত্তরে থাকুন, দক্ষিণে থাকুন, পূর্বে থাকুন, পশ্চিমে থাকুন, ধ্যানে থাকুন, দরবারে থাকুন, আপনি এখানে আসুন, বসুন)।

ইন্নি ভক্ত ফনা ... লুঁয়ে তঙহাঁ

হাঁজা তঙহাঁ, চাজা তঙহাঁ

মাঁয়ে তঙহাঁ, কস্য তঙহাঁ

খিপুংতই তঙহাঁ, সিপুংতই তঙহাঁ

অবনি খায়ে ইননি শ্রাব সাঁশাঐ।।

(আপনার ভক্ত অমুক ... রোগে শোকে, জ্বর জারিতে, পেট ব্যথায়, মাথা ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে। সে-কারণে নিরাময়ের জন্য আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে)।

ইননি ভক্তলে কাঙায়াসেই

তিনি নৌঅ চাজাও নাই মাঁয় ক্রুই

আরেক কাঁসঃ চাংরি

জাউনি দা ফায়ে

ইননি পাঁদা পুঙ

আমঙ স্লিয়া যোগাজাহাঁ।।

(আপনার ভক্ত দীন দরিদ্র। আজ খাওয়ার ভাত ঘরে নেই। তবুও মাথার পাগড়ি কোমড়ের কাপড়, হাতের দা বিক্রয় করে অতিকষ্টে আপনার জন্য বলির পাঁঠা, মদ ইত্যাদি যোগাড় করেছে)।

নুং ফাইয়াদি আচৌ ফাইদি

রাংজাউনি খাঁফ্লাই অ অচৌ ফাইদি

রাংজাউনি খায়ঃ অ তয় তঙঐ

নং জাকং জাউঃ সুফাইদি

রাংজাউনি মাঁয়খলাই বাই মাঁয় চারয় জানই।।

(হে দেবতা! আপনি দয়া করে আসুন, বসুন। সোনার পিড়ীতে বসুন। সোনার ঘটিতে জল রাখা আছে। আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিন। সোনার থালে আহার দেব)।

অ পুঞ্জুয়াহা তিনি লে নুং আমং নিখায়ে

তাঁ জাউঃ নাইহাঁ অবনি খায়ে চিনি মুঁহাফ দায় ক্রুই

ইননি উমসমা উমফালে স্কাঙচি স্নায়তাংখৈ জাহাঁ

নিনি উসবঃ তাং দাউঃ যে নুংখাদে

জাকং তঙদাউঃ যে খাঃ খাংমাঁইয়া

ইননি জৌমাঁইয়াউঃ নিমা লাঁ ক্রুই খা

আবনি খায়ে চুংন তা সারাইয়াদি।।

(হে পাঁঠা! আজ তোমাকে বলি দেয়া হবে। এজন্য আমরা দায়ী নই। তোমার মা-বাবা আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তোমার চোখ থাকতে দেখতে পারছ না। পা থাকতে পালিয়ে যেতে পারছ না। তুমি অসহায়। এজন্য আমাদিগকে অভিশাপ দিও না)।

অ আমং বুড়াহা নুং ফুঁজানি পুঞ্জুয়ান লাসাউদি

থে থঃহা ফ ক্রংহা অ ক্লাইয়া দই

সুয়াই ইননি সখং অ ক্লাইসাঁনাদই

নুং চায়ে খাকচাংয়ে শ্রাব রৈদি

য়েঁফ ফনানি কসা হাঁনাদৈ।।

হে বুড়া দেবতা! আপনি বলির পাঁঠা গ্রহণ করুন। এক ফোটা রক্তও যেন মাটিতে না পরে। সব যেন আপনার মুখে পড়ে। আপনি খেয়ে তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করুন যাতে ফলনার রোগ সেরে যায়)।

অ মতাই তাউঃলে নংইননি তঙথাই-অ ফেরাও থাংদি

র-অ তঙয়ে সিয়া চ্রাইহারাউ নি জাকং ইননি মসাউঃ অ নাংনা ফ বুদমু

ব্রয় আবুনি রি ইননি মসা উঃ অ নাংনা ফ তং ঐ

অবনি খায়ে নুং ইননি তং থাই অ ফেরাওয়ে যাংদি

থাং ফুঃ অ ইননি ভাক্তনি হাঁজা চাজা তংখন লগে অ তৈনাংদি।।

(হে দেবতা! এবার আপনি স্বগৃহে চলে যান। এখানে থাকলে অবুঝ শিশুরা আপনার গায়ে পা দিয়ে লাথি মারতে পারে। অশুচি মহিলার কাপড় আপনার গায়ে লাগতে পারে। আপনি তখন শাপ দিতে পারেন। বরং আপনি যথাস্থানে ফিরে যান। যাওয়ার সময় আপনার ভক্তের রোগ শোক দশা দণ্ড সাথে করে নিয়ে যান)।

উচই সমাজে পুরোহিত আছে; কিন্তু পুরোহিতদের নিয়ে পৃথক ব্রাহ্মণ বর্ণের আবির্ভাব হয়নি। গুণ ও কর্মানুসারে যে-ব্যক্তি এর উপযুক্ত, তাকেই পৌরহিত্যে বরণ করা হয়। ধর্ম কর্মে সাহায্যকারী চার ধরণের লোক আছে। মান-মর্যাদানুসারে তাদের বলা হয় যথাক্রমে, অচাই, তাঁচরাই, বারুয়া এবং দুয়ারি। এসব কাজ সাধারণত পুরুষরাই করে। তারা বিয়ে করতে পারে এবং তাদের ছেলেমেয়েদের সাথে সাধারণ লোকের ছেলেমেয়ের বিয়েতে বাধা নেই।

বিবর্তনের ও বিকাশের ধারায় যদি কোন ধর্মমতকে মোটামুটি চারটি স্তরে-কৌলিক, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, ভাগ করা যায় তবে উচইদের সাবেকি ধর্মমতকে দ্বিতীয় স্তরে ফেলতে হয়। রহস্যাবৃত দুর্বার প্রাকৃতিক শক্তির নিকট অসহায় মানুষের বেঁচে থাকার প্রবৃত্তি-প্রসূত ভয়ভক্তি মিশ্রিত আবেদন ও নিবেদন ইহার প্রধান অঙ্গ। জড়াত্মাবাদ, উর্বরতাবাদ, প্রতীকবাদ, যাদু, ডাইনিতন্ত্র, বহুত্ববাদ প্রভৃতি উচইদের ধর্ম মতের আবশ্যক অঙ্গ।

১. উৎপত্তি

উচইদের ধর্মমতের উৎপত্তি হয়েছে, কিন্তু বিকাশ হয়নি, বিকাশের পূর্বেই অংকুরে বিনাশের চেষ্টা চলছে। উচই, তিপ্রা, রিয়াং, হালাম, লুসাই, কুকি, গারো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ধর্মমতের উৎপত্তি কিভাবে হল? প্রশ্নটিকে একক ও বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে, বরং সারা পৃথিবীর শতাধিক কৌলিক, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ধর্মের আদি উৎপত্তির ইতিহাস সংক্ষেপে অনুধাবন করলে একটি সার্বিক ধারণায় আসা যায়। সেই ধারণার আলোকে উচই ধর্মমতের উৎপত্তি আর রহস্যাবৃত থাকে না। নীচে বিভিন্ন মতামতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হল।

অনেকের মতে কোন প্রেরিত পুরুষ দৈবাদিষ্ট হয়ে ধর্মমত প্রবর্তন করেন। যেমন ঈশাই ও ইসলাম। লউ হার্বার্ট (১৬৬৩) এবং জন টোলান্ড (১৬৯৬) এর মতে মানুষের প্রজ্ঞাই ধর্মের বীজ। ই. বি. টাইলর (১৮৩২-১৯১৭) (১৮৭১) এর মত ভিন্ন। তাঁর মতে জড়াত্মবাদ (animatism, animism) ধর্মবোধের প্রথম সূত্রপাত। হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০-১৯০৩) তার প্রেত তত্ত্বে বলেন পূর্ব পুরুষ পূজন দিয়ে ধর্মকর্মের শুরু। রবার্টস্টন স্মিথ (১৮৮৫) এবং জেভন্স (১৮৯৬) এই মত পরিস্ফুট করেন যে আদি প্রতীক বা পিতৃভক্তি (টোটেম) হল ধর্মের প্রাচীনতম রূপ। বিশপ কডরিংটন (১৮৯১) মেলানেশিয়ানদের সংস্কৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে ঐশী শক্তির (মনা) প্রতি ভয়ভক্তি থেকে ধর্মের আরম্ভ বলে মনে করেন। জেমস ফ্রেজারের (১৮৫৪-১৯৪১) (১৯১১) মতে যাদু হল প্রাক-ধর্মীয় স্তর; যাদু ইন্দ্রজাল ক্রমে ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করেছে। কারো-কারো মতে ধর্মের জন্মদাতা ভয়। আবার কেউ-কেউ মনে করে, ধর্মবোধ মানুষের অন্যতম সহজাত প্রবৃত্তি। এডওয়ার্ড (১৯৭৫) ধর্মের উৎপত্তির একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর মতে বাঁচার তাগিদ হল মৌলিক উপাদান।

এইভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। সন্দেহ নেই, পরিবেশ ভেদে মানুষের প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নতা হয়। এতৎ সত্বেও মানুষের বিচিত্র ধর্মাচরণের পশ্চাতে একটি সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব। মানব মনের অন্তরালে কোন এক অন্তঃশীলা ফল্গুধারা প্রবাহিত যা সকলকে সঞ্জীবিত করে। এই শাশ্বত ও সর্বজনীন সহজাত প্রবৃত্তি হল বাঁচার আগ্রহ। লক্ষ লক্ষ বছর আগের সহায়-সম্বলহীন আত্মবিশ্বাসহীন আদি মানবের নিকট যা কিছুই দুর্গত দশার অনুপূরক তাকেই সে আশ্রয় করেছে। ডুবন্ত ব্যক্তি সামান্য খড়কুটাকেও আশ্রয় করে। এ যুগে প্রশস্তি করে প্রশাসকের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা আদায় করার মতো, কল্পিত অলৌকিক শক্তিধর দেবদেবীর প্রশংসা, স্তুতি, বলিদান করে আদিমানব নিজের বাঁচার কণ্টকাকীর্ণ পথ সুগম করতে চেয়েছিল। প্রতিকূল পরিবেশ ও প্রতিবেশীর সহিত এঁটে উঠতে দেবদেবীর সাহায্য প্রার্থী আদি মানব অন্যভাবেও যোগ ক্ষেম করেছে। হাতিয়ার, অস্ত্র-শস্ত্র বানিয়েছে, আগুন উৎপন্ন করেছে, শিকার করেছে। ধর্মের বিবর্তনের প্রাগৈতিহাসিক স্তরে ত্যাগ, তিতিক্ষা, মোক্ষ, ন্যায়, নীতি, সদাচার, ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস, আশ্রম, দান-দক্ষিণা সেবা ইত্যাদি অনুপস্থিত ছিল। ইহজীবন লক্ষ্য, দেবদেবী উপলক্ষ্য ছিল। ঐহিক জীবনের প্রতি চরম

আসক্তি সারা পৃথিবীর মানুষের ছিল। আত্মশক্তিতে ও বিজ্ঞানের বলে বলিয়ান আধুনিক মানুষের স্তরে ধর্মাচরণে উচ্চতর আদর্শ, ইহ-জীবনের প্রতি উদাসীনতা, মুক্তির বাসনা, রিপুদমন, সাধনা এবং সচ্চিদানন্দ লাভের আকাংঙ্খা অনেক পরে আসে। স্মরণীয় কালের মধ্যে, এর প্রথম প্রকাশ ভারতের বেদ-উপনিষদ। সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ। সর্বে সন্তু নিরাময়ঃ। সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু। মা কশ্চিদ দুঃখভাগ ভবেৎ (যজুর্বেদ)। অসতো মা মদগময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ)।।

উচইদের ধর্মমত বিশ্লেষণ করলে মানব মনের এক শাশ্বত অভিপ্রায় ধরা পড়ে। বনের, জুম খেতের, পাহাড়ের, ধানের, স্নান ঘাটের, মদের, বাস্তু ভিটার এবং মৃত্যুর ক্ষেত্রে অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর কল্পনা উচইদের মধ্যে বিদ্যমান। এদের পূজা দিলে খেত খামারে ফসল ভাল হয়; শিকারে সফলতা আসে; রোগ-শোক নিরাময় হয়; বিশুদ্ধ পানীয় মিলে; ঘরে বসবাস নিরাপদ হয় বলে বিশ্বাস। এজন্য কখনও তারা দেব-পদে সমর্পণ করে, কখনো জাদু বলে নিজেই ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট। কালক্রমে তাদের ধর্ম হয়ে উঠবে জটিল ও যৌগিক।

২. জড়-আত্মাবাদ (এনিমিজম)

জড় পদার্থেও জীবন, আত্ম ও ব্যক্তিত্ব আছে, এ বিশ্বাস তাবৎ দুনিয়ার বহু লোকের; নৃতাত্ত্বিক সাহিত্যে ইহাকে বলা হয় এনিম্যাটিজম। এ সম্বন্ধে প্রথম ব্যাপক গবেষণা করেন ই. বি. টাইলর (১৮৭১)। তিনি লক্ষ্য করেছেন, শিলা, সমুদ্র, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, ঝরনা, গাছ-গাছড়া, নক্ষত্ররাজি, মেঘ প্রভৃতির, মানুষের মতোই, নিজস্ব প্রাণ-মন-আত্মা আছে বলে অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস। তারা কথাবার্তা বলে, মত বিনিময় করে। কিছুদিন পর মানুষের চিন্তা একটু পরিবর্তন হল। মানুষের মধ্যে একটু-একটু শিক্ষার-বিস্তার হল। এবার ভাবতে লাগল, শিলা থেকে সমুদ্র, নক্ষত্র থেকে তরুলতা এসব কিছুর স্ব স্ব প্রাণ নেই বটে, তবে ঐসবে কোন দেব দেবতা, ভূত প্রেত ডাইনি সাময়িককালের জন্য আশ্রয় নেয়, বসে বিশ্রাম করে। এই পরিবর্তিত বিশ্বাসের নাম দেয়া হয়েছে এনিমিজম।

ত্রিপুরার তিপ্রা, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, উচই, হালাম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলো সাধারণ জড়াত্মাবাদী বিশ্বাস আছে। তারা প্রায় সকলেই এখানকার উঁচু পর্বতগুলোকে বছরে একবার পূজা দেয়। স্নানের ঘাটে নদীকে পূজা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে। তাদের ঘরে সংরক্ষিত লক্ষ্মীর পাতিলে হলংসা নামে পাথর যুগলের পূজা নিত্য দেয়া হয়। লোক বিশ্বাস, পাথর দম্পতির সন্তানাদি হয় এবং বর্ধিষ্ণু পরিবারে বেশি হয়। তাদের বিশ্বাস, চন্দ্র সূর্য দুই ভাই। পালাক্রমে ওরা বাবাকে খাওয়াত। একদিন সূর্য মা-বাবার খাবারের সাথে বিষ্ঠা মিশিয়ে দেয়। তাই মা-বাবার অভিশাপে ওর কিরণে এত অসহ্য তেজ। চন্দ্র এমন দুর্ব্যবহার করেনি। তাই ওর কিরণ স্নিগ্ধ। আরো বিশ্বাস, চন্দ্র সূর্য কোন এক ব্যাঙের কাছ থেকে ধান-চাল ঋণ করে নিয়ে ফেরৎ দেয়নি। তাই গ্রহণ হয়।

তাদের আরো বিশ্বাস, মানুষ রাত্রে ঘুমানোর পর, তার আত্মা দেহ থেকে সাময়িকভাবে বেরিয়ে যত্রতত্র স্বাধীনভাবে ঘুরে, ফিরে, বেড়াতে পারে। এই আত্মা সাধারণত ফড়িং-এর রূপ ধারণ করে বেড়ায়। তাই সন্ধ্যার পর ফড়িং মারা নিষেধ। তারা মনে করে যে তাল, তেতুল ও চালিতা গাছে ভূতপ্রেত ডাইনিরা থাকে। বনে বুড়াছা, হাইচুমা প্রভৃতি খল দেব-দেবী থাকে।

৩. ঐশী শক্তি (মনা)

এক অদৃশ্য অকৃত্রিম, অক্ষয় অচিন্তনীয়, অচ্ছেদ্য, অতীন্দ্রিয় শক্তি ক্বচিৎ কতিপয় ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে থাকে বলে লোক বিশ্বাস। দ্বীপবাসী মেলানেশিয়ানদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে এই বিশ্বাস বিশপ কডরিংটনের (১৮৯১) নজরে পড়ে। মেলানেশিয়ানদের ভাষায় ইহাকে বলা হয় মনা। ত্রিপুরায় তিপ্রা, উচই প্রভৃতি সমাজে এই বিশ্বাসকে বলা হয় সুয়। এই সুয় রাজা, মহাপুরুষ, অতিমানব, অব্যর্থ শিকারি, দুর্ধর্ষ সৈনিক প্রভৃতির মধ্যে বিরাজ করে। কোনো-কোনো যন্ত্রপাতি শ্রী-মন্ডিত। সেসব যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে গেলে মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়। আবার কোনো-কোনো ব্যক্তিকে দেখলে অযাত্রা। তাদের মুখ দিয়ে যার প্রশংসা বাক্য উচ্চারিত হয় তার ক্ষতি অনিবার্য। কোন হৃষ্টপুষ্ট শিশু, পশু, শাবক, খেত, কৃষিকে দেখে সে প্রশংসা করলে অমঙ্গল হতে বাধ্য। তাই মুখ-দোষ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে শিশুর ও শাবকের গলায়, হাতে, কোমড়ে নানা তাবিজ ও তাগা পড়ানো হয়, এবং শরীরের কোথাও খুঁত করে দেয়া হয়। কৃষিক্ষেত্রে কালো পাতিল, পিছা-ঝাঁটা, ঝাড়ু, পুরোনো জুতা বেঁধে দেওয়ার রীতি দেখা যায়।

৪. আদি প্রতীক (টোটেম)

কোন পশু, পাখি প্রাণীর বস্তুর সহিত কোন নরগোষ্ঠীর রক্তের সম্পর্ককে নৃতত্ত্বের ভাষায় টোটোমিজম বলা হয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে বিশ্বাস ক্যাঙারু তাদের আদি পিতা। ক্যাঙারুকে তারা হত্যা করে না, বরং শ্রদ্ধা করে, ওর মাংস খায় না। মারা গেলে শোক প্রকাশ করে। ত্রিপুরার রিয়াং সমাজের বিশ্বাস গরুড় বিহঙ্গ থেকে তাদের জন্ম হয়েছে। এছাড়া উচই ও রিয়াং সমাজে কাছিম, মাছ, বাঘ, শূকর, বাদ্যযন্ত্র, বাঁশ, ফল প্রভৃতি নামানুসারে কতিপয় বংশের ও গোষ্ঠীর নাম আছে। লোকস্মৃতি স্বল্পকাল স্থায়ী। তাই সেসব প্রাণীও বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সম্পর্ক বর্তমানে শিথিল হয়ে গেছে। সেই প্রাণীর মাংস খায়।

৫. যাদু (ম্যাজিক) অভিচার

শত্রু নিধন, মামলায় জয়, প্রিয় সঙ্গ লাভ, মারণ, উচাটন, বশিকরণ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে কতকগুলো গোপন প্রক্রিয়া প্রায় সব সমাজে আছে। ইহা যাদু বা ম্যাজিক নামে পরিচিত। নৃতত্ত্ববিদরা ইহাকে দুইভাগে ভাগ করে। উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, সৎ উদ্দেশ্যে করলে শ্বেতাঙ্গ যাদু। অসৎ উদ্দেশ্যে করলে কৃষ্ণাঙ্গ যাদু। পদ্ধতিগত দিক থেকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, অনুকরণীয় যাদু এবং সংস্পর্শীয় যাদু। শত্রুর দেহের অনুকরণে মূর্তি বা ছবি

এঁকে তাতে বা কোন গাছে মন্ত্রপূত বাণ, তীরধনুক মারলে শত্রুর দেহকে আঘাত করে। অপরপক্ষে শত্রুর দেহের সংস্পর্শে ছিল এমন কোন বস্তু, যথা-নখ, চুল, পায়খানা, প্রস্রাব বা কাপড়ের কোণা সংগ্রহ করে তাতে মন্ত্রপূত বাণ মারলে শত্রুর ক্ষতি হবে বলে লোক বিশ্বাস। শুধু তাই নয়, মিত্র বেশে নিযুক্ত কোন গুপ্ত শত্রুর সাহায্যে খাদ্য দ্রব্যের সহিত মন্ত্রপূত খাবার এমনভাবে খাইয়ে দেয়া হয় যে শত্রু টের পায় না, অথচ সেই বিশেষ খাবার ক্রমেই শত্রুর দেহে দুরারোগ্য ব্যাধি সৃষ্টি করে। একাজে নিযুক্ত হয় কোন ওঝা। ত্রিপুরার উপজাতি সমাজেও এসব যাদুর প্রচলন আছে। শনি বা মঙ্গলবার, অযুগ্ম সংখ্যা, অমাবস্যা, বার বেলা, কালবেলা, কালো সুতা প্রভৃতি যাদু ক্রিয়ায় ফলদায়ী বলে মনে করা হয়।

৬. ডাইনী তন্ত্র বা উইচক্রাফট্

ভূত, প্রেত, ডাইন, ডাইনী, মায়াবিনী, অপদেবতায় বিশ্বাস সর্বজনীন। উচই, রিয়াং, তিপ্রা, জমাতিয়া, হালাম, লুসাই, নোয়াতিয়া, গারো প্রভৃতি ত্রিপুরী সম্প্রদায় সমূহ এর ব্যতিক্রম নয়। তাদের ভাষায় ডাইনীকে বলে সিকাল। জ্বরাগ্রস্ত, জীর্ণশীর্ণ, কিম্ভূৎ কিমাকার-দর্শন ব্যক্তিকে ডাইনী ভর করে বলে লোক-বিশ্বাস। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে হত্যা বা সমাজচ্যুত করা হতো। ত্রিপুরায় একাধিক গ্রামের নাম ডাইন-মারা। ডাইন, ডাইনীরা গভীর রাতে চলাফেরা করে, লোকের রক্ত চুষে নিতে সক্ষম। ডাইনে পাওয়া ব্যক্তি আপনা-আপনি হাসে, কাঁদে, কথা বলে। তার চোখ রক্তবর্ণ। ডাইন, ডাইনীরা ভাদ্র মাসের অমাবস্যা তিথিতে গভীর রাতে চালিতা গাছের নীচে দলে-দলে যোগদান করে এক সভায় মিলিত হয় বলে বিশ্বাস। ১৮৮১ সালে সোনামুড়া মহকুমার একগ্রামে কপিরায় রিয়াং নামে এক হতভাগ্য ব্যক্তিকে ডাইনী সন্দেহে হত্যা করা হয়েছিল। ১৯৫৫ খ্রিঃ, চিচরিছড়া-নিবাসিনী আপইমা উচইকে ডাইনী সন্দেহে গ্রামছাড়া করা হয়েছিল।

৭. উর্বরতাবাদ (ফার্টিলিটি কাল্ট)

বন্ধ্যা নারীর বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণে, গৃহপালিত পশু পাখির বংশবৃদ্ধিকল্পে, খেতের অধিক ফলনে, গাঁও প্রধানের সম্মান বৃদ্ধিতে, মোট কথা ধন-জন-মান-বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবস্থা প্রায় সবদেশে সব সমাজে আছে।

ভূমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি ভেড়া বা একজন মানুষকে বলি দিয়ে বলির মাংস মাঠে পুঁতে রাখা হতো। কোথাও একটি পশুকে পুড়ে, ছাই খেতে ছিটানো হতো। খেতে খামারে সংগম, অশ্লীল নৃত্য গীত পরিবেশন এসব পৌষ্টিক উৎসবের অঙ্গ বলে ধরে নেয়া হয়। এসব অন্যত্র হত, ত্রিপুরাতে ছিল না।

ত্রিপুরার তিপ্রা, রিয়াং, উচই, নোয়াতিয়া প্রভৃতি সমাজে ধান বেশি হওয়ার জন্য মাইনুকমা দেবীকে পূজা দেয়া হয়, প্রয়োজনমত বৃষ্টি হতে জলদেবী তুইবুমা দেবীকে, কার্পাস বেশি

ফলতে খনুমা দেবীকে, ধন ও মান বৃদ্ধি কল্পে সাংরাংমা দেবীকে, বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণার্থে নকছু মতাই দেবীকে, গৃহপালিত পশুর বংশ বৃদ্ধি করতে বুড়াছা দেবতাকে পূজা দেবার প্রথা প্রচলিত আছে। দক্ষিণ-পশ্চিম ত্রিপুরার বাঙালি সমাজে বন্ধ্যাত্ব দূর করতে ক্ষেত্র পাল নামক এক দেবতার পূজা হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে।

৮. বহুত্ববাদ (পলিথেইজম)

উচইরা সর্বশক্তিমান একেশ্বরে বিশ্বাসী। তেমনি ছোটো খাটো বহু দেবদেবীতেও শ্রদ্ধাপরায়ণ। তাদের ধারণা দেবদেবী অলৌকিক শক্তিধর হলেও, মানবিক স্বভাব ও প্রবৃত্তি সম্পন্ন। দেবতাদের পরিবার আছে, কেউ-কেউ খল স্বভাবের, কেউ-কেউ মিষ্টি মধুর স্বভাবের। পূজা পেয়ে তাঁরা আশীর্বাদ দেন। না পেলে অভিসম্পাত দেন। এদের পূজনের জন্য স্তবস্তুতি, মন্ত্র-তন্ত্র, বলিদান প্রথা প্রচলিত। রোগ শোক উপলক্ষ্যে এবং বাৎসরিক পূজার বিধান আছে। বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে সপ্তাহব্যাপী এক সর্বজনীন পূজা পার্বণ অনুষ্ঠিত হয় যা গড়িয়া নামে পরিচিত। শীতকালে পাড়া বন্ধন পূজাকে বলে '**কের**'। কের পূজার প্রশাসনিক তাৎপর্য হল সীমান্ত সুরক্ষা। খার্চি পূজার দার্শনিক তাৎপর্য হল সমন্বয়বাদ। লৌকিক স্তরে বহুত্ববাদ; ক্রমেই উর্দ্ধমুখী পরিণতস্তরে একত্ববাদ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনুশাসন ও প্রশাসন

স্বায়ত্ব শাসন মূলক প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য উচই, তিপ্রা, রিয়াং নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, হালাম, লুসাই, গারো প্রভৃতি সমাজে সুপ্রাচীন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব গাঁও পঞ্চায়েত ছিল। ছিল প্রথাগত বিধান। তাদের প্রাচীন প্রশাসন ছিল ছোট, শক্তিশালী, প্রত্যক্ষ, সামনা-সামনি, সরল, জোরদার, কার্যকরী, সরাসরি, সন্নিকট, সন্নিবদ্ধ ও স্বল্পব্যয়ী। প্রায় প্রত্যেক বড় পাড়ায় শতাধিক পরিবার বাস করত। তন্মধ্য থেকে বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন পাঁচ ছয় জন পুরুষ গ্রামবাসীদের দ্বারা বাৎসরিক বৈঠকে মনোনীত হত। এসব পদ বংশানুক্রমিক নয়। তবে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পিতার মৃত্যুর পর পুত্রকে প্রতিনিধি হতে দেখা যায়। পঞ্চায়েতের সদস্যদের শুধু জনগণের আস্থা ভাজন হলেই চলে না, দেবতাদেরও আস্থাভাজন হতে হয়। কোনো গ্রাম প্রধানের কার্যকালে পাড়ায় অসুখ, অশান্তি, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, মামলা, মোকদ্দমা, ঝগড়া,

বিবাদ লেগেই যদি থাকে, তবে জনগণ বিশ্বাস করে গাঁও বুড়ার প্রতি দেবতার আশীর্বাদ নেই। তাকে বদলালেই সুখ শান্তি আসবে। ক্ষমতার হস্তান্তর সহজ ছিল। যখন-তখন হত না।

অতীতে প্রত্যেক উপজাতির দ্বিস্তরীয় প্রশাসনিক কাঠামো ছিল, গাঁও পঞ্চায়েত এবং সর্বোপরি উপজাতীয় পঞ্চায়েত। তখন এক-একটি উপজাতির জনগণ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে কাছাকাছি বাস করত। কিন্তু, কালক্রমে তারা খাদ্যের অন্বেষণে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। এই সমস্যা সমাধানার্থে অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ত্রিপুরী সমাজ চতুর্থ স্তরে উন্নীত হতে পারলো। রিয়াং, জমাতিয়া তৃতীয় স্তর অবধি উন্নীত হল। কিন্তু উচইদের ক্ষেত্রে ইতিহাস একটু ভিন্ন। তাদের মধ্যে মাত্র দুটো স্তর। লোকসংখ্যার স্বল্পতা এবং ঘন বসতি এ দুটো কারণে আঞ্চলিক পঞ্চায়েত গঠন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি; এমনকি, উপজাতীয় স্তরে যে-পঞ্চায়েত আছে তা নামে মাত্র। এই সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে আজও বাস করছে। ফলে দ্বিধাবিভক্ত এই সম্প্রদায়ের শীর্ষে কোনো মজবুত সংগঠন নেই। প্রাচীন পঞ্চায়েত এখন মৃত-প্রায়। এর সামান্য ছিটেফোঁটা মাত্র বিদ্যমান। নীচে প্রাচীন পঞ্চায়েতের কিঞ্চিৎ পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হল।

কামি ফাং ঃ কামি= পাড়া, ফাং=মাথা। চৌধুরী নামেও পরিচিত। গ্রামাধিপ।

খেরপাং ঃ সহকারী বা উপপ্রধান। কারবারি নামেও পরিচিত।

কাসকাও ঃ কোষাধ্যক্ষ।

জকুস ও তুইসি ঃ দপ্তরি ও পেয়াদা।

অচাই ঃ পুরোহিত।

উচইদের আঞ্চলিক পঞ্চায়েত নেই। গ্রাম পঞ্চায়েতের পরই আছে সর্বোপরি উপজাতীয় পঞ্চায়েত। সেই পঞ্চায়েতের শীর্ষে আছে উপজাতীয় প্রধান। তিনি সার্পা বা রোয়াজা নামে পরিচিত। তার সহকারী রূপে, পাইক, পেয়াদা, পুরোহিত ইত্যাদি ছিল। দুই ভিন্ন রাষ্ট্রে (ভারত ও বাংলাদেশ) বসবাসকারী উচই সম্প্রদায় এখন বিভক্ত। ফলে তাদের উপজাতীয় পঞ্চায়েতের ভাবমূর্তি বর্তমানে ম্লান এবং অস্তিত্বহীন।

সাবেকি গাঁও পঞ্চায়েতের কাজ ছিল বহু ও বিচিত্র ধরণের—প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয়, আইন বিষয়ক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও প্রতিরক্ষামূলক। জুমের খেত বন্টন, ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা, বারোয়ারি পূজার উদ্যোগ আয়োজন, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদন, পারিবারিক কলহ মীমাংসা, শত্রুর আক্রমণ থেকে গ্রাম রক্ষা, গ্রামের স্থানান্তর ও পুনর্বাসন, সরকারি কর প্রদান, রাজপুরুষদের সাথে যোগাযোগ, আগন্তুকদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, রোগে-শোকে, অভাবে-অভিযোগে গ্রামবাসীদের সহায়তা করা—ইত্যাদি গ্রাম পঞ্চায়েতের মুখ্য কাজ ছিল।

ফলমূল আহরণ, মাছ ধরা, শিকার, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ, জুমের খেতে কাজ, পশুপালন এসব সাধারণত পূর্বাহ্নে শুরু করে মধ্যাহ্ন অবধি চলত। অপরাহ্নে প্রায় সকলেই পাড়াতে থাকত। যুবক-যুবতীরা গ্রামের আড্ডাখানায় গল্পগুজব করে সময় কাটাত। বয়স্ক পুরুষরা চৌধুরীর দাওয়ায় বসে পান তামাক খেতো, নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করত। চৌধুরীর দাওয়ায় বৈঠক প্রায় প্রতিদিন বিকেলে বসত। তখন পাড়ার বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা ও মীমাংসা হত।

পাড়ার প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিষয় জানত। মিথ্যা বলার, তথ্য গোপন করার সুবিধা কম ছিল। দলাদলি ছিল না। দৃষ্টিভঙ্গিতে, চিন্তা ভাবনায় সাদৃশ্য ছিল। ফলে বিচার সহজেই চিরাচরিত প্রথানুসারে হয়ে যেত। তবুও যদি মিথ্যাচারণ করত কেউ, তবে প্রতিজ্ঞা এবং পরীক্ষার দ্বারা সত্যতা নির্ধারণের ব্যবস্থা ছিল। তাতেও ন্যায় বিচার না পেলে আহত পক্ষ কখনও অভিশাপ দিত। সন্দেহভাজন পক্ষ নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা করত—(১) অন্যায় করলে, আমাকে বাঘে খাক, (২) আমি হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে মরে যাই, (৩) আমার সন্তান অকালে মারা যাক, (৪) আমার কঠিন রোগ হোক, (৫) আমার পেটে শেল প্রবেশ করুক। এ ধরণের প্রতিজ্ঞা তিপ্রা, রিয়াং নোয়াতিয়া, জমাতিয়া সমাজে ক্ষীয়মান অবস্থায় আছে।

তিপ্রা, রিয়াং, উচই, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, হালাম প্রভৃতি সমাজে সেকালে প্রথাগত বিধানের সাহায্যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হতো।

১. উচইদের সমাজ নিযন্ত্রক পঞ্চায়েত

উচই সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রধান প্রতিষ্ঠান হল গাঁও পঞ্চায়েত। এটি পাড়া-ভিত্তিক সংস্থা। গ্রামাধিপ হলেন মুখ্য কার্যকর্তা। তিনি কামিফাং বা চৌধুরী নামে অভিহিত। কামি শব্দের অর্থ হল পাড়া; ফাং শব্দের অর্থ হল মাথা। বংশভিত্তিক, জনপদভিত্তিক, বিকেন্দ্রিক, অলিখিত, পরম্পরাগত গাঁও পঞ্চায়েত হল উচদের সমাজ-নিয়ন্ত্রণের চিরাচরিত প্রতিষ্ঠান। গাঁও পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা জনা পাঁচেক। তারা নির্বাচিত নয়, মনোনীত। তাদের নেতা এক-নায়ক নয়। তাদের মাসিক ভাতা নেই, লিখিত আইন নেই, সরকারী কার্যালয় নেই, নির্দিষ্ট সময়সূচি নেই, উকিল মোক্তার নেই; অথচ বহুকাল যাবৎ চালু আছে এই স্বয়ং-ক্রিয় ক্ষুদ্র সমিতি।

২. পরিবার

উচই সমাজ গড়নের প্রথম একক হল ব্যক্তি; দ্বিতীয় একক হল পরিবার। স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী স্বামী, স্ত্রী, কয়েকটি অবিবাহিত পুত্র কন্যার সমষ্টি হল পরিবার। পরিবারের প্রকৃতি পিতৃতান্ত্রিক। উচই পরিবার সামাজিক-অর্থনৈতিক একক হিসাবে কাজ করে। পরিবারে সম্প্রীতি ও সংহতি বিরাজমান; স্বামী বা পিতা হলেন কর্তা। সমাজ গড়নে জটিলতা কম। ব্যক্তি, পরিবার, কুল, বংশ, উপজাতি এই পাঁচটি পর্যায় নিয়ে উচই সমাজ গঠিত। উচই সমাজ ১২টি বংশ নিয়ে গঠিত। বংশকে বলা হয় পাঞ্জি। তন্মধ্যে পাইংতমা বংশ সবচেয়ে বড় ও প্রভাবশালী।

৩. বিবাহ

পরিবার হল নিত্য সম্পর্কযুক্ত সমবায়; বিবাহ হল প্রতিষ্ঠিত আচার। পরিবার হল সঙ্গ; বিবাহ হল সংস্কার। উচই সমাজে পরিবার ও বিবাহ সমাদৃত। বিবাহকে বলা হয় কাইলামি। বিবাহে বরের চাইতে কন্যার বয়স কম হওয়া কাম্য। কন্যার বয়স১৬ কিংবা ১৭, বরের বয়স ১৮ কিংবা উনিশ বিশ হলে আদর্শ মনে করা হয়। বড় বোন থাকতে ছোট বোনের বিবাহ কাম্য নয়। তেমনি বড় ভাই অবিবাহিত থাকতে ছোট ভাইয়ের বিবাহ অনভিপ্রেত। বিয়ের পর, নব বধু পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামীর বাড়ীতে আসে। আট প্রকার বিবাহ বিধি অনুমোদি।

পণপ্রথা উচই ও অন্যান্য সমাজে প্রচলিত। এক্ষেত্রে প্রাচীন প্রথামতে কনের পিতা-মাতাকে পণ দিতে হয়, যেমন মদ, কাপড়, অলংকার, গৃহপালিত পশু-পাখী, উন্নত মানের খাদ্য-শস্য প্রভৃতি। অধিকন্তু, শারীরিক শ্রম দিয়ে প্রাক্ বিবাহকালে, ভাবী বর স্বীয় যোগ্যতা প্রমাণ করতে বাধ্য। লোকবিশ্বাস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবকের সাথে বিয়ে দিলে, বিবাহ-বিচ্ছেদের সম্ভাবনা কমে যায়।

এক স্বামী, এক স্ত্রী বিবাহ আদর্শ বিবাহ। তবে এক স্বামীর কয়েক স্ত্রী বিবাহ মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু কয়েক স্বামী এক স্ত্রী বিবাহ অনুমোদন পায় না।

উচই সমাজ অন্তঃবিবাহ যুক্ত অর্থাৎ বিবাহ বৃহত্তর উচই সমাজের অভ্যন্তরে থাকলেই আদরনীয়। কিন্তু কার্যতঃ উচই সমাজের বাইরে কন্যা দিতে; অন্য সমাজ থেকে কন্যা আনতে কোন কঠোরতা নেই।

নব দম্পতির বসতি হতে হবে নতুন স্বামীর পিতৃালয়ে। নতুন বউ বাবার বাড়ী ছেড়ে স্বামীর বাড়ীতে আসবে। নতুন স্বামী বাবার বাড়ী ছেড়ে বউ-এর বাড়ীতে যাবেনা।

পুনর্বিবাহ অনুমোদন পায়। বিধবা, বিপত্নিক, বিচ্ছেদ প্রাপ্ত, বিচ্ছেদ-প্রাপ্তা হলে গাঁও পঞ্চায়েতের বিচার বিবেচনা সাপেক্ষে পুনরায় বিবাহ করতে আপত্তি নেই। জ্যাঠা, পিতা, কাকা, মামার সহিত কন্যার, ভ্রাতষ্পুত্রীর বিবাহ নিষিদ্ধ। মা, মাসী, জ্যোঠি, কাকি, মামীর সহিত পুত্র, দেবর কুমার, ভাগিনার বিবাহ নিষিদ্ধ। স্ত্রী বিয়োগের পর শ্যালিকাকে বিবাহ করা যায়। স্বামী বিয়োগের পর দেবরকে বিবাহ করা যায়।

৪. বিবাহ বিচ্ছেদ

বিবাহ ছেলে খেলা নয়; ঠুনকো কারণে ছাড়াছাড়ি চলে না। যুক্তি সংগত কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদে সায় দেয় সমাজ। রোগ-শোক, অকাল মৃত্যু, অপমৃত্যু, নিরুদেশ, প্রভৃতি কারণে গাঁও পঞ্চায়েত অনুমোদন দেয়। কিন্তু অনাচার, ব্যভিচার, দুর্ব্যবহার, যন্ত্রণা প্রভৃতি কারণ দর্শালে, পঞ্চায়েত বিচার করে, দোষী পক্ষকে সাজা দেয়, পারিবারিক বন্ধনকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে।

৬. দত্তক গ্রহণ

দত্তক গ্রহণসমাজ-অনুমোদিত প্রথা। সন্তানহীন দম্পতি ইচ্ছা করলে, মৌখিক আবেদন করতে পারে। গাঁও পঞ্চায়েত নিঃসন্তান দম্পতিকে অবজ্ঞা, অবহেলা করে না; তাদের সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করে। প্রাক্-বিবাহ সম্পর্কের ফলে কোন মেয়ে যদি মা হয়ে যায়, তবে ঐ পরিবার লজ্জায় মুখ দেখাতে পারে না; পাড়ায় কানা-খুসা চলে; একটি অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। গাঁও প্রধান ডেকে পাঠায় পিতা মাতাকে এবং তিরস্কার করে, সাবধান করে। অবশেষে ঐ মেয়েকে ডাকে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে অপরাধীর নাম প্রকাশ করতে বাধ্য করে। যদি উভয়ের মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ বিবাহ দেবার মত, তবে অপরাধীকে বাধ্য করা হয় বিয়ে করতে; পিতা মাতাকে বলা হয় সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়মিতকরণ করে নিতে। অন্যথায়, অভিযুক্তকে আর্থিক দন্ডে দন্ডিত করা হয়। ঐ পরিবার সেক্ষেত্রে ভ্রুণ হত্যার পথ দেখে। এতে যদি ঐ মেয়ে রাজী না হয়, তবে ভাবী শিশুর সামাজিক মর্যাদার হানি ঘটে।

৭. সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য

উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, শ্মশানে পরিবারের সদস্যদেরও পাড়া প্রতিবেশীর প্রতি সহকর্মী ও সহযোগী হওয়া উচইদের মূল্যবোধের অন্তর্গত। তাদের অবশ্য কর্তব্য হল পিতা -মাতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যার ভরণ-পোষণ, লালন-পালন করা। এই লক্ষণ রেখা অতিক্রম করে পাড়া প্রতিবেশীর বিপদে আপদে, সম্পদে-সমারোহে যথাসম্ভব যোগদান, জুমচাষে, ঘর-বাড়ী নির্মাণে পূজা-পার্বনে, ভাগীদার হওয়া তাদের দায়িত্ব। ঘন সন্নিবিষ্ঠ ঘর বাড়ী থাকাতে এই যোগদান হয় সহজেই, সর্ব্বদাই, সর্ব্বক্ষেত্রে।

৮. সম্পত্তি

এখানে সম্পদ শব্দটিকে গুণ বাচক অর্থে ব্যবহার করা হয় নি। বরং স্বত্ত্ব স্বামীত্ব, ভোগ দখল, অধিকার, আইনগত মালিকানা, বেচা কেনা, বিলি বন্টন প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার করা হল। উচইদের মধ্যে সম্পত্তির ধারণা বিবর্তনশীল।

উচইদের চিন্তা চেতনার আদি স্তরে কতিপয় বস্তুকে সম্পত্তি বলে মনে করা হত, যেমন শিকারের যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, বস্ত্র, গৃহ, গৃহপালিত পশু-পাখীর (শূকর, মোরগ, কুকুর), ধান-চাউল, খাদ্য দ্রব্য। অতি প্রাচীন কালে ভূমিকে সম্পত্তি বলে গণ্য করা হত না ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, নেয়াতিয়া, উচই, হালাম, কুকি, গারো সমাজে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভূসম্পত্তির ধারণার উন্মেষ হয়েছে। অধুনা, স্থাবর সম্পত্তির ধারণা বিকশিত হয়েছে।

৯. উত্তরাধিকার

ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, উচই সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। কিন্তু গারো ও খাসিয়া সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। বিবাহের পর কন্যারা চলে যায় স্বামীর ঘরে। পুত্ররা পিতা-মাতার সাথে থাকে।

কন্যারা পৈত্রিক সম্পত্তি পায় না। পুত্ররা বৃদ্ধ পিতা মাতাকে সেবা করে ও পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগীদার হয়। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বিয়ের কয়েক বৎসর পর জ্যেষ্ঠ পুত্রদের আলাদা ঘর করে নিতে অনুমতি মিলে। কনিষ্ঠ পুত্র থাকে পিতা-মাতার সাথে। ভাগের সময় কনিষ্ঠ পুত্র সামান্য একটু বেশী পেতে পারে। পুত্ররা মোটামুটি সমভাগে ভাগ পায়। এ-সব ভাগাভাগির সময় গাঁও পঞ্চায়েতের উপস্থিতিও অনুমোদন আবশ্যক।

১০. প্রাকৃতিক সম্পদ

ত্রিপুরার সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের স্বত্বাধিকারী হলেন ত্রিপুরার রাজা। তাই তাঁকে বুবাগ্রা বলা হত। এই সব প্রাকৃতিক সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করা হত ঃ- খাস সম্পত্তি ও জোত সম্পত্তি। রাজ সরকার থেকে যথা বিহিত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত স্বত্বকে বলা হত জোত সম্পত্তি। জোতের বাইরে সব সম্পত্তি খাস সম্পত্তি, অর্থাৎ রাজ সম্পত্তি।

উচই পাড়ার আশে-পাশে অবস্থিত খাস সম্পত্তিতে প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন শাক সবজি, লতা পাতা, বাঁশ, গাছ, ছন, ফল মূল, পশু, পাখী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি ভোগ করার সুযোগ-সুবিধা পেত প্রতি পরিবার। এ-জন্য রাজাকে ঘর চুক্তি কর দিতে হত।

১১. প্রশাসনিক পদে মনোনয়ন, কার্যকাল

প্রথাগত বিধান অনুযায়ী, উচই সমাজের কর্ণধার ও নিয়ন্ত্রকরা নির্বাচিত হয় না; মনোনীত হয়। কার্যকাল মাত্র একবৎসর; কিন্তু পুনরায় মনোনীত হতে বাধা নেই। প্রতি পরিবারে থাকে একজন পুরুষ কর্তা; প্রতি পাড়াতে থাকে একটি পঞ্চায়েত। প্রতি বৎসর জুমের বপন কাজ শেষ হলে পর চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ ব্যাপী গড়িয়া উৎসব হয়। তখন পঞ্চায়েত সমিতির পুনর্গঠন, নবীকরণ ইত্যাদি করা হয়। যদি বিগত এক বৎসরের মধ্যে ঝগড়া, মামলা, বিবাদ, দুর্ভিক্ষ রোগ-শোক অন্যান্য উৎপাৎ ঘটে থাকে তবে সমিতির বদল আবশ্যক মনে করা হয়। যদি সব কিছু ঠিকঠাক চলে তবে পুরাতন সমিতিকে আর এক বছর কাজ করতে অনুমোদন দেওয়া হয়। এসব কাজে কোলাহল, হলাহল হত না। সে কালে দল ছিল না; ব্যক্তির গুণ-মান দেখে মনোনয়ন দেওয়া হত।

১২. অপরাধ

ভালয়, মন্দয় সৃষ্টি। ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, গারো, হালাম সমাজে যে-সব অপরাধ সংঘটিত হত, সে-সব উচই সমাজেও ছিল। এ-সব সমাজের লোকজন সকলেই সন্ত নয়, সকলেই অসাধু, অসৎ নয়। সকলেই দার্শনিক নয়, সকলেই দাগী আসামী নয়। অপরাধের ধারণায়, আকারে-প্রকারে পরিবর্তন ঘটছে। উচই সমাজে কতিপয় অপরাধের নাম এরূপ—অগ্নি সংযোগ, অবমাননা, অপযশ, অপবাদ, অপহরণ, অবিচার, অস্ত্রধারণ, প্রতারণা, প্রহার, বিবাদ, সীমানালঙ্ঘন, মিথ্যা সাক্ষ্য, দন্ড পারুষ্য, ঝগড়া, কৃষ্ণাঙ্গ যাদু, ডাইনী সন্দেহে নির্যাতন, বিষ-প্রয়োগ, যৌবনাচার।

তালিকাটি একটি নমুনামাত্র। সকলেই, সব সময় সর্বত্র এসব অপরাধ করে না। পারলৌকিক বিশ্বাসবশত নরমুন্ড ছেদন বহু পূর্বেই নিষিদ্ধ হয়েছিল। পরিবর্তে, একটি কাল মোরগশাবক মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে বলিদান করা হয়। মনুষ্য অপহরণ, লণ্ঠন এখন করা হয় না। বসবাসের স্থিতি, আর্থিক উন্নতি, শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি, সরকারী চাকুরীতে অংশগ্রহণ বিধায় অপরাধ প্রবণতা অনেকাংশে কমেছে। ব্যক্তির বিরুদ্ধে, পরিবারের বিরুদ্ধে, সম্পত্তির বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, অপরাধ ক্ষয়িষ্ণু, কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রবণতার অঙ্কুর অনুভবযোগ্য।

শাস্তি বিধান

অভিযোগের বিচার ও শাস্তি বিধান ছিল গাঁও পঞ্চায়েতের হাতে। অপরাধ নিবারণ, ক্ষতিপূরণ ও সংশোধনের ধারণা অন্তর্নিহিত ছিল। অধুনা যা ভয়ানক অপরাধ, অতীতে তা অপরাধ বলে গণ্য করা হত না। যেমন পুনঃজন্মে বিশ্বাস ও প্রেতাত্মায় বিশ্বাস বশতঃ নরমুন্ড ছেদ করে মৃতের পাশে উৎসর্গ করা প্রাচীন কালে অপরাধ মনে করা হত না। ৬৪২ খৃষ্টাব্দে আনীত মৈথিলী ব্রাহ্মণদের প্রভাবে ত্রিপুরী সমাজে কালক্রমে মৃতের পাশে কাল মোরগ ছানা বলিদান প্রথা প্রবর্তিত হল। ত্রিপুরী রাজকুলের আদর্শ-স্থানীয় রীতি-নীতি পরে অন্যেরা অনুসরণ করতে শুরু করল। আর এক প্রকার উদাহরণঃ জুমের প্রথম ফসল ক্ষেত্র দেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হবে, নইলে দেব দেবীরা নারাজ হবেন।

অভিযোগ অস্বীকার করা হলে, প্রতিজ্ঞা, পরীক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ বিধেয়। প্রতিজ্ঞার পরিণাম দেখতে সময় লাগে, কিন্তু পরীক্ষার পরিণাম তাৎক্ষণিক দেখা যায়।

উচই সমাজে প্রচলিত প্রথাগত বিধানের এক অসম্পূর্ণ সংকলন নীচে তালিকাভুক্ত করা হল—

১. শিকারে খুব বড় পশু পেলে প্রতিবেশীর মধ্যে ভাগ করে খেতে হয়।
২. পাড়ার চতুঃপার্শ্বের বনভূমিতে অধিকার পাড়ার সকলের সমান।
৩. পাড়ার চৌধুরীর ঘর, জুমখেত ইত্যাদি করে দেয়া পাড়াবাসীর কর্তব্য।
৪. শিকারে পাওয়া জন্তু, মাছ, খেতের ফসল ইত্যাদির খানিকটা চৌধুরীকে দিতে হয়।
৫. বিবাহের আগে যুবকের উচিত বাঁশ বেতের ঝুড়ি, দোলনা বানানোর শিক্ষা গ্রহণ করা।
৬. বিবাহ করার আগে যুবতিদের সেলাই, মদ তৈরি ও রান্নার প্রক্রিয়া জানা উচিত।
৭. শিকারে ও বাঁশ বেতের কাজে পুরুষের অধিকার, মহিলার একাজ করা নিষেধ।
৮. কাপড় বুনন, মদ তৈরির কাজে মহিলাদের একচ্ছত্র অধিকার।
৯. জীবন সঙ্গী নির্বাচনের আট প্রকার প্রথা আছে। বাল্য বিবাহ অধুনা রহিত। সাবালক (২১ এবং ১৮ বৎসর) বিবাহ অনুমোদিত।
১০. চার বছর চার মাস কন্যার বাড়িতে খেটে তবে কন্যার পাণিগ্রহণ করার নিয়ম।

১১. ভাবী জামাইকে অত্যধিক খাটানো নিষেধ।

১২. কন্যা পণ ১২০ টাকা, মায়ের কোল ছাড়ানি বাবদ। বর পণ নেই।

১৩. বিবাহ-বিচ্ছেদে সাব্যস্ত দোষীর শাস্তি ৬০্ + ৩০্ + ২্ + ১টি শূকর।

১৪. স্ত্রী ভাসুরের দেহ স্পর্শ করতে পারবে না, ভাসুরের সাথে কথা বলতে পারবেনা।

১৫. স্বামী তেমনি স্ত্রীর দিদির দেহ স্পর্শ করতে পারবে না।

১৬. জ্যাঠার, পিতার, কাকার, মামার সহিত কন্যার, ভ্রাতষ্পুত্রীর বিবাহ নিষিদ্ধ।

১৭. মার, মাসির। জ্যেঠির, কাকির, মামির সহিত পুত্র, দেবর-কুমার, ভাগিনার বিবাহ নিষিদ্ধ।

১৮. স্বামী শ্যালক শ্যালিকার সহিত গল্প ঠাট্টা করতে পারে।

১৯. স্ত্রী দেবরের সহিত গল্প ঠাট্টা করতে পারে।

২০. বিধবার ও বিপত্নীকের পুনর্বিবাহ চলে।

২১. এক পুরুষ একাধিক স্ত্রী রাখতে পারে।

২২. কিন্তু এক মহিলা একাধিক জীবিত স্বামী রাখতে পারে না।

২৩. স্ত্রী বিয়োগের পর শ্যালিকাকে বিবাহ করা যায়।

২৪. স্বামী বিয়োগের পর দেবরকে বিবাহ করা যায়।

২৫. মেয়েরা পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ পায় না। পুত্ররা সমভাগে পায়। তবে কনিষ্ঠ পুত্র একটু বেশি পায়।

২৬. চরিত্রহীনতার শাস্তি শূকরের খোয়ারে একদিন বেঁধে রাখা, মুখে চুনকালি মেখে পাড়ার দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরানো।

২৭. গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণের শাস্তি প্রায়শ্চিত্ত। গর্ভবতী মহিলার কতিপয় খাবার খাওয়া নিষেধ।

২৮. কন্যা মাতার গোত্র পায়, পুত্র পিতার গোত্র বা গোষ্ঠী পায়।

২৯. একে অপরকে কাটবে বলে দা, তাক্কল দেখালে এক শিশি মদ জরিমানা হয়।

৩০. আক্রমণে উদ্যত হলে এক শিশি মদ ও ৩০্ টাকা জরিমানা দিতে হয়।

৩১. প্রত্যেক পাড়ায় একটি পঞ্চায়েত থাকবে।

৩২. চৌধুরীর বাড়িতে বিচার, বৈঠক, বারোয়ারি পূজা পার্বণ হবে।

৩৩. পঞ্চায়েত সদস্যরা কোন মাসিক মাহিনা পাবে না।

ইহা অনস্বীকার্য যে বর্তমানে উচই, তিপ্রা, রিয়াং, জমাতিয়া, হালাম, কুকি প্রভৃতি সমাজের সাবেকি সামাজিক নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে আসছে। প্রাচীন পঞ্চায়েত এখন প্রায় অপাংক্তেয়। গাঁও

বুড়ার ক্ষমতা ক্রমহ্রাসমান। সরকারি প্রশাসন, আইন, আদালত ও আমলারা শূন্যস্থান পূরণ করছে। অধিকন্তু রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটছে। একাধিক উপজাতির লোক মিলে এক রাজনৈতিক দল গড়ছে। উচইদের মধ্যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে একটি সামাজিক সংঘ সম্প্রতি গড়ে উঠেছে। এর নাম রাখা হয়েছে 'উচই জাতিনি আতাই বাং' (১৯৭৯)। এর উদ্যোক্তা ভিক্ষু অক্ষয়ানন্দ। তিনি উচই বংশোদ্ভূত বহুদেশদর্শী এবং আগরতলা বৌদ্ধ-মঠ 'বেনুবন বিহার' এর অধ্যক্ষ।

উচইরা বর্তমানে তাদের সাবেকি সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রশাসনের সীমিত ও গণ্ডির সীমা ছাড়িয়ে বহির্জগতে এসে পড়েছে। সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কূটনীতি বিভিন্ন রূপে উচই ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে ব্যক্তি জীবনকে আন্দোলিত করছে।

তদুপরি, ভারতীয় সংবিধান মোতাবেক গাঁও পঞ্চায়েত গঠনের কাজ ত্রিপুরায় ১৯৬২ সাল থেকে শুরু হয়। বর্তমানে সারা রাজ্যে গাঁও পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে। গোপন মতদানে আইন সিদ্ধ ও সরকার অনুমোদিত নয়া গাঁও পঞ্চায়েত এখন জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। এতে আছে দলাদলি, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বীতা, প্রচার-প্রসার।

সপ্তম অধ্যায়

রূপান্তর

ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে সমাজ ও সংস্কৃতি স্থিতিশীল নয়, গতিশীল। পরিবর্তন প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি জটিল, বিচিত্র ও বহুমুখী। কিন্তু পরিবর্তনের পরিণতি নির্ণয় করা কঠিন। ত্রিপুরার উপজাতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি এই চরাচরের প্রাকৃতিক বিধান বহির্ভূত নয়। তাদের সংস্কৃতিতে বরং দ্রুতগতিতে পরিবর্তন হচ্ছে। নীচে উচইদের জীবন প্রণালীতে পরিবর্তনের কিঞ্চিত আভাস আলোচিত হল।

শ্বাপদ সংকুল অথচ বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশ তিরোহিত হচ্ছে। স্বজাতীয় লোকের কাছ থেকে নরমুণ্ড ছেদনের সম্ভাবনাজনিত অনিশ্চিত অবস্থার অবসান ঘটেছে। আরেকদিক থেকে ভাবলে দেখা যায়, চতুষ্পদ জন্তুর চাইতে দ্বিপদ জন্তুর ভয় বাড়ছে।

(১) পরিবেশ পরিবর্তনের দরুণ উচইদের দেহ সৌষ্ঠব ও মানসিকতায় পরিবর্তন আসছে।

দুর্গম গিরি কন্দরে বসবাস করায় চড়াই উৎরাই পথে পায়ে হাঁটায়, বন্যজন্তুর সাথে লড়াই করায় এবং মশলাহীন সেদ্ধ দ্রব্য খাওয়ায় উচইদের দেহ সুঠাম ছিল। চোখের পাতিতে ভাঁজ (এপিকানথিক ফোল্ড) ছিল। বর্তমানে চারিদিকে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, চিকিৎসালয় হচ্ছে। অন্য বংশ ও বর্ণের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। মন হয়ে উঠছে ভাবপ্রবণ ও কল্পনা বিলাসী। জীবনযাত্রায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সমাগত। জীবনকে সফল করার দুর্নিবার সংকল্প জাগছে।

(২) আধা যাযাবরীয় জীবনে ছেদ পড়েছে। সঞ্চরণের গতি স্তব্ধ হয়েছে। জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক সীমারেখা সুদূর অতীতে ছিল না। খাদ্যের সন্ধানে, অধিক উর্বর কৃষিক্ষেত্রের খোঁজে যদৃচ্ছা ঘুরে বেড়ানো যেত। এক্ষণে মাটির সহিত স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। তিপ্রা, রিয়াং, কুকি, হালাম, উচই, মগ, চাকমা প্রভৃতি উপজাতিরা ভূমিহীন নয়, সর্বহারা নয়। এখন প্রত্যেক পরিবারের বাড়ি-ঘর, জায়গা-জমি আছে। অনাবাদি ও খাস ভূমি বিস্তর। ফলের বাগান করার অঢেল সুযোগ বর্তমান। অধুনা রাবার চাষ করছে অধিকাংশ পরিবার।

(৩) উচইদের অর্থনীতি ছিল আদিম। যন্ত্রপাতি ছিল অত্যল্প। বনের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা ছিল, শ্রমের বিশেষীকরণ ছিল না। আর্থিক বৃত্তি যাদু-মিশ্রিত ছিল। সমতলবাসীদের সাথে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের ফলে যন্ত্রপাতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বিশেষীকরণ হচ্ছে। যাদুর প্রভাব কমছে। লাঙলে গরুতে সমতল ভূমি চাষ, ব্যবসায়, চাকরি, ঠিকাদারি প্রভৃতি পেশার সাথে পরিচিত হচ্ছে,বিচক্ষণ হয়ে উঠছে উচই যুবকরা। বিনিময় প্রথার স্থলে, মুদ্রার প্রচলন হয়েছে।

(৪) আদিম আর্থিক সাম্যের তিরোভাব ঘটছে। ধনী গরীবের ফারাক সৃষ্টি হচ্ছে। মহাজনি, তেজারতি কারবার, দাদন প্রথা, কৃষি ভৃত্য খাটানোর রেওয়াজ গড়ে উঠছে। শোষক, ঠকবাজ টাউট, দালালের আবির্ভাব হচ্ছে উচইদের নিজেদের মধ্যেই। উচই চিন্তা-চেতনার মর্মস্থলে যুগধর্ম (গীতা ঃ ১৬.১২) স্থান করে নিচ্ছে।

(৫) আগেকার গ্রামগুলো ছিল পাহাড়ের চূড়ায়, এক উপজাতি অধ্যুষিত ও ঘন সন্নিবিষ্ট। বর্তমানে তারা নীচু টিলায় নেমে পড়েছে। এক পাড়ায় অন্য জাতিও উপজাতির লোক বসবাস করছে। ঘর বাড়িগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে নির্মিত হচ্ছে।

(৬) আগে প্রতি পাড়ায় ছিল বহু বসত ঘর, একটি মাত্র আড্ডাঘর এবং সারিবদ্ধভাবে সাজানো গোলাঘর। এক্ষণে আড্ডাঘর নেই। নেই সারিবদ্ধ গোলাঘর। তৎপরিবর্তে, প্রতি পরিবারের একাধিক বসতঘর, গোশালা, পাড়ায় পাঠশালা, উপাসনালয় গড়ে উঠছে। ঘরবাড়ি নির্মাণ পদ্ধতি পরিবর্তিত হচ্ছে। নীচু ভূমিতে, মাটি, ইট বা টিন দিয়ে আধুনিক ঘর নির্মিত হচ্ছে।

(৭) পোশাক পরিচ্ছদ অলংকারে পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। কলকারখানায় প্রস্তুত পোশাক, পাদুকা, স্বর্ণকারের দ্বারা তৈরি অলংকার প্রাক্তন পোশাকের স্থান দখল করছে। অধুনা রাজনৈতিক সচেতনতা জাগার ফলে প্রাচীন পোশাকের প্রতি প্রীতি জাগছে।

(৮) খাদ্যাভ্যাসে উল্লেখযোগ্য পবিরর্তন আসছে। খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী খুব বেশি পরিবর্তিত হচ্ছে। পান, বিড়ি, সিগারেট, চা, তেল-মশলা ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবহার বাড়ছে। মদের অপকারিতা উপলব্ধি করতে পারছে এবং ব্যবহার অনেক পরিমাণে কমে গেছে। প্রায় প্রতি পরিবারেই খাবারের গুণগত ও পরিমাণগত মান উন্নত হচ্ছে।

(৯) বড় যৌথ পরিবার ভেঙে ছোট পরিবার গড়ে উঠছে। গ্রামের বাড়ির বাইরে পড়াশুনা, প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও চাকরির খাতিরে ছোট পরিবার অধিক সুবিধাজনক বিবেচিত হচ্ছে।

(১০) বিবাহের পদ্ধতিও পাল্টাচ্ছে। আগে কন্যা পণ ছিল। এখন হয়েছে তার বিপরীত। জামাই খাটতে কেউ আর রাজি হয় না। তদুপরি বর যদি শিক্ষিত ও চাকুরে হয় তো কথাই নেই। বর পণ নগদে না হলেও জিনিসপত্রের মাধ্যমে দিতে হয়। বাল্য বিবাহ রহিত হয়েছে সাবালক বিবাহ প্রচলিত হয়েছে।

(১১) অবসর বিনোদনের উপায়ে পরিবর্তন কম আসেনি। তাস, পাশা, দাবা, লুড্ডু, ফুটবল, ভলিবল, কেরাম, ক্রিকেট, ছায়াছবি ও দূরদর্শনের সহিত তারা এখন পরিচিত। ত্রিপুরার উপজাতিদের রূপকথায় বহু বিচিত্র অভিপ্রায় (মটিফ) বর্তমান, যেমন পরিত্যক্ত সন্তান, অস্বাভাবিক বিবাহ, অনাথ বীরপুরুষ, সৌভাগ্যবান কনিষ্ঠ পুত্র, বিকলাঙ্গ বীর, অস্বাভাবিক বীরত্ব, পাতালপুরী, কথা বলা পশুপাখি, দৈব প্রভাব ও আর্শীবাদ, দ্রুতবর্ধমান বৃক্ষ ইত্যাদি। চাঁদ সদাগর বা ধনপতি সদাগর জাতীয় কোন নায়ক এসব গল্পে নেই, কারণ সমুদ্রপথে বাণিজ্যের ঐতিহ্য অনুপস্থিত। তেমনি, পীর, ফকিরের কাহিনি নেই, কারণ মুসলমান শাসনের প্রভাব ত্রিপুরার উপজাতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে রুন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রবেশ করতে পারেনি। কোনো-কোনো গল্পে রামায়ণ, মহাভারত ও পঞ্চতন্ত্রের উপাখ্যানের প্রভাব সুস্পষ্ট।

(১২) তাদের ধর্মীয় আচরণের বহিরাবরণ কতকগুলো অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কার-এ আচ্ছন্ন। পূজাপার্বনে অজস্র বলি, রোগে ব্যাধিতে জীববলি তাদের দুর্বল অর্থ ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। যেন তলীহীন ডুলা। এসব অন্ধ বিশ্বাসগুলোকে চিহ্নিতকরণ ও রহিতকরণ দরকার। অবশ্য অধুনা অনেকটাই অনাদৃত।

(১৩) হাতির দেবতা, বাঘের দেবতা, বনদেবতা, পাহাড়ের দেবতা, পূজা, শিকারে সফলতার জন্য, গৃহপালিত পশুর রোগ সারাতে, হারানো শিশু ও পশু ফিরে পেতে হাইচুমার পূজা, জুকসর জন্য মনোনীত স্থানের মাটি এনে বিছানায় শুয়ে কুস্বপ্ন দেখলে ঐ স্থান পরিত্যাগ, ফলের বাগান করলে অপদেবতার উপদ্রব হবে বলে বিশ্বাস, ডাইনী সন্দেহে কাউকে হত্যা বা সমাজচ্যুত করা - এইসব বিশ্বাস পুনর্বিবেচনা করে দেখার সময় এসেছে। নিঃসন্দেহে, এসব সমাজে বিজ্ঞান-মানসিকতার উন্মেষ হচ্ছে। প্রতিবেশী অন্যান্য সমতলবাসী সমাজেও অতীতে এমন বিশ্বাস ছিল। বৃটিশ সমাজ সংস্কারক John Wycliffe (১৩২০-১৩৮৪)-এর রচনায় উল্লেখ করা হয়েছে ইউরোপীয় সমাজেও ডাইনীতে বিশ্বাসের কথা।

(১৪) তিপ্রা, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, উচই এই পাঁচটি সম্প্রদায়ের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মাচরণে গভীর সাদৃশ্য আছে। আঞ্চলিক ও উচ্চারণগত পার্থক্য দূর করে এক ধর্মীয় আচার সংহিতা প্রণয়ন অসম্ভব নয়। পুরোহিত দর্পণ জাতীয় গ্রন্থ রচিত হলে এদের ধর্মমত পরবর্তী স্তরে উন্নীত হতে পারে। এতে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে, হীনমন্যতা কাটবে। স্বজাতীয় সংস্কৃতির অবক্ষয় রোধ সম্ভব হবে।

(১৫) ভারত মহামানবের সাগর তীর। বিভিন্ন জাতের সংশ্লেষে ভারতীয় সমাজ গঠিত। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ইহার মূল সুর। নানা জাতির লোক যখন এই ভারতীয় জীবন স্রোতে মিশে যায়, তখন কিন্তু যার-যার কুলাচার, লোকাচার বিসর্জন দিতে হয়নি। প্রত্যেকের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। কেবল কতিপয় তামসিক ভাবাপন্ন আচারকে পরিমার্জিত করে নেয়া হয়েছে। পূর্বের নরমুণ্ড ছেদন বা নরবলির বদলে লঘু সংস্করণ চালু করা হয়েছে, যৌনাচারের পরিবর্তে ঠাট্টা-তামাসা প্রবর্তিত হয়েছে। কোথাও-কোথাও লৌকিক ও গ্রাম্য দেবতার অব্রাহ্মণ পুরোহিত্যের পৌরোহিত্য ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের লোকেরা মেনে নিয়েছে। এ বিষয়ে অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুর উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ-

'হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতির সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির বিশ্লেষণ করলেও আমরা এইরূপ ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ পাই। কোথাও প্রাচীন কোনো গ্রাম দেবতার পূজা এখনও অজলচল জাতির অধিকারে রহিয়াছে, অথচ উচ্চবর্ণের সকল জাতি সেই দেবতার পূজায় অনার্যের পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া থাকেন। কটক জেলায় বাঁকির নিকট বৈদ্যেশ্বর এবং রামনাথ মহাদেবের মন্দিরের সেবক অজলচল মালি জাতির মানুষ। পুরীতে জগন্নাথদেবের মূর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে শবর জাতির দৌহিত্র বংশজ দইতাপতিগণের কেবল অধিকার আছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী বহু জাতির মধ্যে বিবাহের সময়ে প্রচলিত স্ত্রী আচারের বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, ব্রাহ্মণ সংস্কারের পূর্বে বিবাহের যে-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, তাহা আজ স্ত্রী আচারের আকারে পর্যবসিত হইয়াছে। এইসকল সামাজিক রীতিনীতি বা আচার ব্যবহার, দেশাচার এবং লোকাচার-নামে ব্রাহ্মণ্য পুরোহিতগণের নিকট মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে। নানা জাতি যখন ব্রাহ্মণের অধীনতা স্বীকার করিয়া বৃহত্তর হিন্দুসমাজ গঠন করিতে লাগিল, তখন কাহারও আচার অনুষ্ঠানকে অকারণে নষ্ট করা হয় নাই। কেবল ব্রাহ্মণ্যনীতির পরিপন্থী কোনও আচার বা অনুষ্ঠান থাকিলে তাহাকে পরিমার্জিত ও সংশোধিত করিয়া লওয়া হইল। ইসলাম, খ্রিস্টিয় অথবা ইহুদিগণের ধর্ম কিন্তু এ বিষয়ে স্বতন্ত্র। সেখানে কোনো মানুষ অপর ধর্ম হইতে আসিয়া স্থান পাইলে তাহাকে পূর্ব সংস্কার প্রায় সর্বথা বিসর্জন দিয়া আসিতে হয়। কিন্তু হিন্দুধর্মের ঔদার্যের ফলে হিন্দু সমাজের মধ্যে অঙ্গীভূত বিভিন্ন জাতিকে সেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া আসিতে হয় না। ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজে স্থান পাইবার পরেও অনেকের মধ্যে প্রাক্তন নাচ, গান, সামাজিক আচার বিচার বহুলাংশে অক্ষত অবস্থায় থাকিয়া যায়।'

'ব্রাহ্মণ্য সমাজের শীর্ষস্থানীয় মুনিঋষিগণ স্বীকার করিতেন যে, সকল মানুষের মন সমান স্তরের নয়। অতএব সকলের পক্ষে মানসিক বিকাশের জন্য একই ভাবধারার আশ্রয় প্রয়োজন হয় না। সমাজে যখন নানা স্তরের মানুষ বাস করে, তখন ধর্মের মধ্যে সকলের সুবিধার জন্য নানা পথ, নানা মতের স্থান থাকা উচিত। ফলত, হিন্দু সমাজ যেমন নানা জাতির সংশ্লেষের দ্বারা রচিত হইয়াছে, হিন্দুধর্মও তেমনই নানা মত ও পথের সংশ্লেষের দ্বারা বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। হিন্দু সমাজের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের ভিতর দ্বিজাতি এবং দ্বিজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণের স্থান যেমন সর্বোপরি, হিন্দু ধর্মের মধ্যেও তেমনই নানা জাতির সংস্কৃতি স্থান পাইলেও বৈদিক সংস্কার এবং বৈদিক চিন্তাধারার স্থানও সর্বোপরি নির্দিষ্ট হইয়াছিল। হিন্দুধর্মের মধ্যে বহু দেবতার স্থান থাকিলেও, নদীর গতি যেমন সর্বশেষে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, এক্ষেত্রেও তেমনই সকল দেবতার পূজা অবশেষে অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্মজ্ঞানে পর্যবসিত হইয়া থাকে।'

পূর্ব ভারতের উপজাতীয় সমাজ শত-শত বছর পূর্বেই বৃহত্তর হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে আসে। কিন্তু হিন্দু ধর্মের তরফ থেকে সচেতন, সক্রিয় ও সংগঠিতভাবে চেষ্টা হয়নি উপজাতীয় সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করার। এর প্রধান কারণ হিন্দু মানসিকতা। হিন্দুরা অন্যের ধর্মমতকে অপসারণ ও উচ্ছেদ করে নিজেদের মত কোনো কালে চাপিয়ে দেয়নি। দিগ্বিজয়ী রাজার সৈন্য-বলে, ধর্মান্ধের দেহ-বলে এবং বণিকের ধন-বলে হিন্দুধর্ম প্রচারিত হয়নি। ভারত থেকে আলেকজান্ডার, গজনীর সুলতান, চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লঙ বের হয়নি। কৌপীন কমন্ডলুসম্বল সন্ন্যাসী, জীর্ণ চীবরধারী ভিক্ষু ভারতের সংস্কৃতির অগ্রদূত। এছাড়া, গত প্রায় সহস্র বৎসর ভারতের বুকে যে বিদেশিয়দের তাণ্ডব নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার ফলে এ-দেশের সমতলবাসী নিজেদেরই গৃহদাহ চলছিল। সেবার হস্ত নিয়ে অনগ্রসর, গিরিগুহাবাসী হরিজন গিরিজনদের কাছে পৌঁছুতে পারেনি। পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্বাধীনতার কয়েক দশকের মধ্যে ভারতীয় সাধু, সন্ন্যাসী, সেবা প্রতিষ্ঠান তাদের দুঃস্থ ভাই-বোনদের নিকট পৌঁছাচ্ছেন। সেবার, সম্প্রীতির, সংহতির এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

ত্রিপুরার মহারাজ অমর মাণিক্য নিজ সৈন্য বিভাগে পর্তুগিজ ফিরিঙ্গিদের নিয়োগ করেন। ফিরিঙ্গিরা উদয়পুরে বসতি স্থাপন করে। পরে ভাগ্যান্বেষী, ভুঁইফোড় সমসের গাজি কর্তৃক ত্রিপুরা আক্রান্ত (১৭৪৭) ও শাসিত হলে রাজপাট স্থানান্তরিত হয় উত্তরে আগরতলায়। তখন ফিরিঙ্গিরা আগরতলায় আসে এবং গির্জা স্থাপন করে পুরাতন আগরতলায় এবং পাড়াটির নাম পাল্টে রাখে মরিয়ম নগর।

পরবর্তী মিশনারি-হাওয়া আসে মণিপুর থেকে। ১৯১১-১২ সালে মিজো পাহাড়ের বনের বাঁশে ব্যাপকভাবে ফুল আসে। এই ফুল আগামী দিনে দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস বহন করে বলে লোক বিশ্বাস। তাই বহু কুকি ও মিজো নিজ বাসভূমি ছেড়ে ত্রিপুরার পূর্ব প্রান্তস্থ জমপই

পাহাড়ে বসতি বিস্তার করে। সেই সূত্র ধরে মণিপুরের থাডু-কুকি-মিশন ত্রিপুরার জমপই পাহাড়ে অনুপ্রবেশ করে। ইতিমধ্যে থাডুকুকি মিশনে ভাঙ্গন ধরে। তাই ত্রিপুরাবাসী শ্রীহাইয়া রাংখল নামক জনৈক হালাম বংশজ ব্যক্তি ১৯৩৫ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়াস্থ নিউজিল্যান্ড ব্যাপটিষ্ট মিশনের সাথে যোগাযোগ করেন। নিউজিল্যান্ড ব্যাপটিষ্ট মিশনের পাদ্রী ইদে এবং জোন্‌স ও সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। ইদে এবং জোন্‌স অনতিবিলম্বে ত্রিপুরা ভ্রমণ করে গেলেন এবং ১৯৩৮ সালে মিশন স্থাপনের জন্য স্থানও অনুমতি পেলেন ঠাকুর সোমেন চন্দ্র দেববর্মা (১৮৯৪-১৯৩৯)-এর মাধ্যমে, মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য (১৯২৩-১৯৪৭)-এর কাছ থেকে। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত নিউজিল্যান্ড মিশন ১০৩টি বিদ্যালয় স্থাপন করে।

১৬) তফশিলি উপজাতি বিষয়ক প্রকল্প রূপায়ণে এবং তাদের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে সরকারকে উপদশে ও পরামর্শ দেয়ার উদ্দেশ্যে আগরতলায় উপজাতি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছে স্বাধীনতার কয়েক বছর পরেই। এই পরিষদ উপজাতি কল্যাণ বিভাগের সহিত সংযুক্ত।

১৭) তফশিলি জাতি ও উপজাতি কল্যাণ বিভাগ নামে একটি সরকারী বিভাগ প্রথম খোলা হয় ১৯৫৩ সালে। প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা ও কাজকর্ম যাতে সুগম হয়, তার জন্য ত্রিপুরার ক্ষুদ্র ভুখন্ডকে বিভক্ত করা হয়েছে ৮টি জিলায়, ২৩টি মহকুমায়, ৫৮টি সমষ্ঠি উন্নয়ন মন্ডলে, ১৮৭টি তহশীলে, ৭১টি থানায়, ৮টি জিলা পরিষদে, ৩৫টি পঞ্চায়েত সমিতিতে। অধিকন্তু ত্রিপুরা উপজাতিয় এলাকা স্বশাসিত জেলাপরিষদ গঠন করা হয়েছে। এছাড়া চালু করা হয়েছে নানা প্রকার সেবা প্রকল্প যেমন ঃ রেগা, আবাস যোজনা, অন্নপূর্ণা, বি. পি.এল ভাতা, অনুদান, সর্বশিক্ষা অভিযান, মাতৃসেবা, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি সেবা প্রভৃতি।

১৮) উচই সমাজের সামগ্রিক রূপটি একই প্রকার নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে, মিজোরামে উত্তর ত্রিপুরাতে, দক্ষিণ ত্রিপুরাতে বসবাসকারী উচইদের মধ্যে পরিবেশ-পরিস্থিতিগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ ত্রিপুরায় বসবাসকারী উচইদের মধ্যে প্রাচুর্য্য, সন্তোষ, প্রশান্তি, প্রগতির প্রবাহ আত্মবিশ্বাস এসেছে। অন্যত্র ভিন্ন পরিস্থিতি থাকতে পারে।

১৯) জীব জগতে পরিবর্তন অহরহ ঘটে চলেছে। মনুষ্য সমাজে পরিবর্তন আরো স্পষ্ট। বিশ্বজোরা শাশ্বত পরিবর্তনের প্রবাহ উচই সমাজকেও স্পর্শ করেছে। এটি অত্যন্ত আনন্দের কথা। তারা পিছিয়ে নেই। মহারাজ বীর বিক্রমের আমলে (১৯২৩-১৯৪৭) ত্রিপুরার অর্থাৎ ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণ এক বুদ্ধির পরিচয়। স্বাধীনতার ও সম্প্রীতির বাতাবরণে সুখে আছে তারা। ১৯৩৫ সালের উচই সমাজ এবং ২০১৬ সালের উচই সমাজ একরূপ নয়। এখন অনেকেই ধণাঢ্য, শিক্ষিত। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বাঁশোয়ারা পরিযোজনা, ইসকন বনবাসী সমাজে সেবা দিচ্ছে।

উপসংহার

১) সেদিন (২৮.১০. ২০১৬) সমাজপতি মাননীয় এরাধন উচই মহাশয় বললেন প্রায় ৬০ শতাংশ উচই পরিবার রাবার বাগান করছে। শ্রী ধনলা উচই তো রাবার শুকানোর দামী যন্ত্রপাতি কিনেছেন। কিন্তু রাবার বাগানের ক্ষতিকারক দিকটি একটু বিবেচনা করলে ভাল হবে। এতে পরিবেশে দূষণ হয়, উষ্ণতা ত্বরান্বিত হয়। শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশ অচিরেই ধ্বংস হবে।

২) উচইদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, মাটি, জল-বায়ু, ফল চাষের পক্ষে অনুকূল। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কমলা, তেঁতুল, মোসাম্বি, কলা, লেবু, তেজপাতা, সুপারি, খেঁজুর প্রভৃতি চাষের প্রতি আরও সুনজর দিলে নগদ অর্থ আসবে অথচ পরিবেশ দূষিত হবে না। এছাড়া শাল, সেগুন, গামাই, কড়ই, বাঁশ প্রভৃতির চাষ খুব লাভজনক হবে।

৩) **উচই সামাজিক আইন ও রীতিনীতি** নামক ঐতিহাসিক পুস্তিকার ভূমিকার প্রথম অনুচ্ছেদে মূল সুরটি ফুটে উঠেছে। এটি উদ্ধৃতি যোগ্য ঃ

"ত্রিপুরা রাজ্যের খুবই সংখ্যালঘু 'উচই' উপজাতি সম্প্রদায় দীর্ঘদিন থেকে পুরুষাণুক্রমে নিজস্বঃ ভাষা, পোষাক, রীতিনীতি ও সংস্কার-সংস্কৃতি বজায় রেখে সমাজ ব্যবস্থা চালু করে আসছে। তবে যুগের তালে তাল মিলিয়ে, পুরাতনের মন্দ সংস্কারগুলি ত্যাগ করে এবং ভাল সংস্কারগুলি সংরক্ষিত করে, নূতনভাবে সমাজকে সুষ্ঠ ও সুন্দর করার চেষ্টা বার বার চালিয়ে যাচ্ছে এবং ধাপে ধাপে সমাজ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।"

সমগ্র পুস্তিকাটিতে ইতিবাচক কথা আছে; নেতিবাচক অভিযোগ নেই, আবেগ নেই, বেদনা বোধ নেই, অস্ত্রের হুংকার নেই, উগ্ররস নেই; আছে আত্মসংশোধনের, মন্দ সংস্কারগুলির ত্যাগের সংকল্প; আছে শান্তরস; আছে এগিয়ে যাবার প্রেরণা ও প্রাণশক্তি। এটি মানসিক পরিপক্কতার, সুস্থ স্বাভাবিক চিন্তা চেতনার পরিচয়। রচনাভঙ্গি পরিমিত ও সংযত। আত্ম প্রত্যয়ের সাথে এগিয়ে যাবার প্রমাণ উচই জাতির কল্যাণ পরিষদ স্থাপনা (১৯৭৯)। ১৯৭৯ থেকে ২০১১ অবধি ১৬টি সম্মেলন করে আত্মসমীক্ষার প্রয়াস চালানো হয়েছে এবং হচ্ছে।

সমাজস্থ, স্বাভাবিক মানুষের মন অংশতঃ জাগ্রত, অংশতঃ সুপ্ত। শিক্ষা, সঙ্গ-সমিতি, সাহিত্য প্রভৃতি সুপ্ত অংশকে জাগ্রত করতে সহায়ক। উদয়ের পথে কিছু বাণী, কানমন্ত্র উচইদের কানে আসছে। সে-সব বাণীর, কানমন্ত্রের চরিত্র যদি উচই সমাজের অন্তর্গত চিন্তশীল ব্যক্তিরা পুনঃ বিচার-বিবেচনা করেন, তবে সমাজের দিশা-নির্দেশ হয়ত সঠিক পথে যেতে পারে। বর্তমানে যা চলছে, তা রোগের চাইতে ঔষধ অধিক ভয়াবহ বলে মনে হয়। 'ধার করা ফুলে পাতায় গাছকে সাজাইলে, তাহা আজ থাকে, কাল থাকে না।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ***স্বদেশ***, পৃঃ ৪০)।। উচই সমাজ বৃহত্তর ত্রিপুরী সমাজের চৌহদ্দির অন্তর্গত। ত্রিপুরার অনেক গৌরবের বস্তু ত্রিপুর রাজবংশের কৃতিত্ব। উচই সমাজ সেই পরম্পরার বিপরীতে পা বাড়িয়ে হাঁটছে।

গ্রন্থ পঞ্জী

১। Ahmed, P.A. : *Terrorism and Terrorist groups of North East India*, Guwahati, 2010.

২। Allen B.C., Gait E.A., Allen C.G.H. & Howard F.H. : *Gazetteer of Bengal & Northeast India*, Delhi, 1979.

৩। Barkataki, S. (edi) : *Tribes of Assam*, New Delhi, 1969.

৪। বসু, নির্মল কুমার ঃ *হিন্দু সমাজের গড়ন*, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

৫। Chatterji, S.K. : *Kirata-Jana-Krti*, Calcutta, 1950.

৬। Das, T.C. : *The Purams*, Calcutta, 1945.

৭। দেববর্মণ, সৌমেন্দ্র চন্দ্র ঃ *সেন্সাস বিবরণী*, ১৯৩১, আগরতলা, ১৯৩৩।

৮। দেববর্মা শ্যামলাল ঃ *সাধারণ সমীক্ষার আলোকে উচই*, আগরতলা, ১৯৮৩

৯। দেববর্মন, বিজয় কুমার *ত্রিপুরার উপজাতি*, আগরতলা, ২০১৬

১০। Edwards, D.M. : *The Philosophy of Religion*, Calcutta, 1975.

১১। Firth, C.B. : *An Introduction to Indian Church History*, Serampore, 1961 (1976)

১২। Gan Chaudhuri : (i) *Village Administration & Justice in ancient Tripura*; Published in the quarterly Review of Historical Studies, Calcutta-1974.

(ii) *The Tipras of Tripura*; (Unpublished) 1976.

(iii) *Tripura : The Land & its people*, Delhi, 1980.

(iv) *The Riangs of Tripura*; Agartala, 1983.

(v) *ত্রিপুরার লৌকিক দেবদেবী*, আগরতলা, ২০০১

(vi) *Folk Tales of Tripura*, Agartala, 2015

১৩। Grierson, C.A. : *The Linguistic Survey of India*, Vol.I, Pt.I, Delhi 1927 (1967).

১৪। Hedlund, R.E. (edi) : *Church Growth in the third world*, Bombay, 1977.

১৫। Lewin, Capt. T.H. : (i) *The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein*, Calcutta 1869.

(ii) *Wild races of South Eastern India*; London, 1870.

১৬। মজুমদার, রমেশ চন্দ্র ঃ *বাংলাদেশের ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ (সম্পাদিত)।

১৭। Menon, K.D. : *Tripura District Gazetteers*, Agartala, 1975

১৮। Mills, J.P. : *The Lhota Nagas*, London, 1922.

১৯। Parry, N.E. : *The Lakhers*, London, 1932.

২০। People's Liberation Army : *Dawn*, Vol.III; Imphal, 1980.

২১। Risley, H.H. : *Tribes & Castes of Bengal*, Calcutta, 1891 (1902).

২২। Russell.B. Why I am not a Christian, London, 1957

২৩। সেন, কালীপ্রসন্ন ঃ *শ্রীরাজমালা*, ২য় লহর, আগরতলা, ১৯২৭।

২৪। Shakespear, Col. J. : *The Lushai-Kuki Clans*, London, 1912.

২৫। Smart, R.B. : *Geographical & Statistical Report on the district of Tipperah*; Calcutta, 1866.

২৬। *Vivekananda Kendra Patrika*, Madras, August 1972.

পরিশিষ্ট

সংখ্যাপঞ্জি - ১

বছর	মোট জনসংখ্যা	দশকে বৃদ্ধি	উপজাতীয় জনসংখ্যা	শতকরা উপজাতি
১৮৭৪-৭৫	৭৪৫২৩		৪৭৫২৩	৬৪
১৮৮১	৯৫৬৩৭	২৮.৩৩	৪৯৯১৫	৫৫
১৮৯১	১৩৭৫৭৫	৪৩.৮৫	৭০২৯২	৫১.০৯
১৯০১	১৭৩৩২৫	২৫.৯৮	৯১৬৭৯	৫২.৮৯
১৯১১	২২৯৬১৩	৩২.৪৮	১১১৩০৩	৪৮.৪৭
১৯২১	৩০৪৪৩৭	৩২.৫৯	১৭১৬১০	৫৬.৩৭
১৯৩১	৩৮২৪৫০	২৫.৬৩	২০৩৩২৭	৫৩.১৬
১৯৪১	৫১৩০১০	৩৪.১৪	২৫৬৯৯১	৫০.০৯
১৯৫১	৬৪৫৭০৭	২৫.৫৬	২৩৭৯৫৮	৩৭.২৩
১৯৬১	১১৪২০০৫	৭৮.৭১	৩৬০০৭০	৩১.০৫
১৯৭১	১৫৫৬৩৪২	৩৬.২৮	৪৫০৫৪৪	২৮.৯৫
১৯৮১	২০৪৭৩৫১	৩১.৫	৫৮৩৯২০	২৮.৫২
১৯৯১	২৭৫৭২০৫	৩৪.৩০	৮৫৩৩৪৫	৩০.৯৫
২০০১	৩১৯১১৬৮	১৫.৭৪	১০৬৯৬২২	৩৩.৫২
২০১১	৩৬৭১০৩২	১৪.৭৫	১১,০৪,১২৯	-

সংখ্যাপঞ্জি - ২

বছর	ঘনত্ব	শিক্ষার হার
১৮৭১	৯	
১৮৮১	১০	
১৮৯১	১৩	
১৯০১	১৭	২.২৮
১৯১১	২১	৪.০৩
১৯২১	২৯	৭.০৮
১৯৩১	৩৬	২.৮৪
১৯৪১	৪৯	
১৯৫১	৬২	১৫.৫২
১৯৬১	১০৯	২০.২৪
১৯৭১	১৪৯	৩০.৯৮
১৯৮১	১৯৫	৪১.৭৮
১৯৯১	২৬৩	৬০.৪৪
২০০১	৩০৪	৭৩.২০
২০১১	৩৫০	৮৭.৭৫

সংখ্যাপঞ্জি - ৩

সন	ধর্ম					
	হিন্দু	ইসলাম	ঈশাই	বৌদ্ধ	শিখ	জৈন
১৯৪১	৩৪৭৭৯২	১,২৩,৫৭০	৩২৮	৭,৭২৪		
১৯৫১	৪,৮০,৬৬২	১,৩৬,৯৪০	৫,২৬২	১৫,৪০৩	২১	
১৯৬১	৮৬,৭৯৯৮	২,৩০,০০২	১০,০৩৯	৩৩,৭১৬	৪৯	১৯৫
১৯৭১	১৩,৯৩,৬৮৯	১,০৩,৯৬২	১৫,৭১৩	৪২,২৮৫	৩১৮	৩৭৫
১৯৮১	১৮,৩৪,২১৮	১,৩৮,৫২৯	২৪,৮৭২	৫৪,৮০৬	২৮৫	২৯৭
১৯৯১	২৩,৮৪,৯৯৪	১,৯৬,৪৯৫	৪৬,৪৭২	১,২৮,২৬০	৭৪০	৩০১
২০০১	২৭,৩৯,৩১০	২,৫৪,৪৪২	১,০২,৪৮৯,	৯৮,৯৯২	১,১৮২	৪৭৭
২০১১	৩০,৬৩,৯০৩	৩,১৬,০৪২	১,৫৯,৮৮২,	১,২৫,৩৮৫	১,০৭০,	৮৬০

সংখ্যাপঞ্জি - ৪ (ক)

ক্রমিক সংখ্যা	উপজাতি	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১
১	তিপ্রা	১৫০৯৭১	১৮৯৭৯৯	২৫০৩৮২	৩৩১১৯১
২	রিয়াং	৪৮৪৭১	৫৬৫৯৭	৬৪৭২২	৮৩৪৭৬
৩	জমাতিয়া	২৭৬৪	২৪৩৫৯	৩৪১৯২	৪৪৫৫৪
৪	চাকমা	৭২৭৭	২২৩৮৬	২৮৬২২	৩৫০৭৯
৫	হালাম	১৬৪৪	১৬২৯৮	১৯০৭৬	২৯০৪০
৬	নোয়াতিয়া	১৯১৬	১৬০১০	১০২৯৭	৭০৭৩
৭	মগ	৩৭৮৯	১০৫২৪	১৩২৭৩	১৮২৯১
৮	কুকি	২৭২১	৫৫৩২	৭৭৭৫	৫৪৩২
৯	গারো	৭৩৬২	৫৪৮৪	৫৫৫৯	৭৩১১
১০	মুণ্ডা	৫১	৪৪০৯	৫৩৪৭	৭৯১৭
১১	লুসাই	১৯৪৭	২৯৮৮	৩৬৭২	৩৭৭৮
১২	ওরাঁও	—	২৮৭৫	৩৪২৮	৫৩০৬
১৩	সাঁওতাল	৭৩৬	১৫৬২	২২২২	২৭০৯
১৪	উচই	—	৭৬৬	১০৬১	১২৯৫
১৫	খাসিয়া	১৫১	৩৪৯	৪৯১	৪৫৮
১৬	ভিল	৪১	৬৯	১৬৯	৭৯১
১৭	লেপচা	৫	৭	১৭৭	১০৩
১৮	ভূটিয়া	১৯	৭	৩	১৯
১৯	ছইমল	—	৫০	—	১১

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর মধ্যে নগরবাসীর হার
১৯০১ থেকে ২০১১ অবধি এরূপ ঃ
৩.৭০, ২.৯৮, ২.৫৪, ২.৫০,৩.৪৫,৬.৬৭,৬.০২,
১০.৪৩,১০.৯৯,১৫.৩০, ১৭.০২,১৮.২৬

সংখ্যাপঞ্জি - ৪ (খ)

ক্রমাঙ্ক	উপজাতি	১৯৯১	২০০১	২০১১
১	তিপ্রা	৪,৬১,৫৩১	৫,৪৩,৮৪৮	৫,৯২,২৫৫
২	রিয়াং	১,১১,৬০৬	১,৬৫,১০৩	১,৮৮,২২০
৩	জমাতিয়া	৬০,৮২৪	৭৪,৯৪৯	৮৩,৩৪৭
৪	চাকমা	৯৬,০৯৬	৬৪,২৯৩	৭৯,৮১৩
৫	হালাম	৩৬,৪৯৯,	৪৭,২৪৫	৫৭,২১০
৬	নোয়াতিয়া	৪,১৫৮	৬,৬৫৫	২৪,২৯৮
৭	মগ	৩১,৬১২	৩০,৩৮৫	৩৭,৮৯৩
৮	কুকি	৯,৩৬০	১১,১৮০	১২,৯৫২
১০	মুন্ডা	১১,৫৪৭	১২,৪১৬	১৪,৫৪৪
১১	লুসাই	৪,৯১০	৪,৭৭৭	৫,৩৮৪
১২	ওরাঁও	৬,৭৫১	৬,২২৩	১২,০১১
১৩	সাঁওতাল	২,৭৩৬	২,১৫১	২,৯১৩
১৪	উঁচই	১,৬৩৭	২,১০৩	২,৪৪৭
১৫	খাসিয়া	৩৮৫	৬৩০	৩৬৬
১৬	ভিল	১,৭৫৪	২,৩৩৬	৩,১০৫
১৭	লেপচা	১১১	১০৫	১৫৭
১৮	ভুটিয়া	৪৭	২৯	২৮
১৯	ছইমল	২৬	২২৬	৫৪৯

সংখ্যাপঞ্জি - ৫ ঃ উচইদের সংখ্যা

সন	সংখ্যা	নারী	পুরুষ	দশকে পরিবর্তন
১৯৬১	৭৬৬	৩৭৬	৩৯০	—
১৯৭১	১০৬১	৫২৭	৫৩৪	+২৯৫
১৯৮১	১৩০৬			+২৪৫
১৯৯১	১৬৩৭			+৩৩১
২০০১	২১০৩			+৪৪৬
২০১১	২৪৪৭			+৩৪৪

উচই সমাজপতি মান্যবর শ্রী এরাধন উচই।

এক সুখী পরিবার।

উচই পুরুষ।

উচই মহিলা।

আধুনিক গৃহ।

বস্ত্র বয়নরতা মহিলা।

শ্রীধনলা উচই ও আধুনিক যন্ত্র।

বাঁশ-বেতের পাত্র ও ঝুড়ি।

ক্ষেত্র সমীক্ষারত গবেষক।

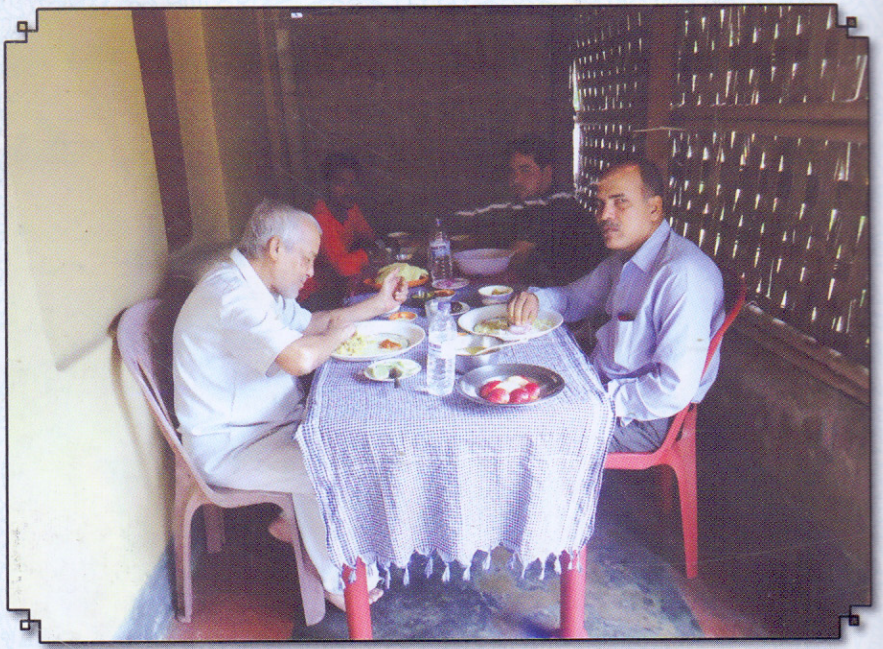

শ্রী ধনলা উচই-এর বাড়িতে আপ্যায়ন।

ISBN-978-81-932589-7-2